ইলেভেনথ আওয়ার

জেমস হেডলি চেজ

সূচিপত্র

১. আঘাত কখন যে কার আসবে 2

২. পেশাদারী গোয়েন্দা..................85

৩. মনের জ্বালা 138

১. আঘাত কখন যে কার আসবে

১.

আঘাত কখন যে কার আসবে কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। রোলো মার্টিনকে প্রথম দেখার পর গোপন মিলিটারী ফাইলে এই মন্তব্যটি লিখেছিলাম।

মার্টিনের দোষের মধ্যে, খুবই পানাসক্ত; ফলে মাঝে মধ্যে সামনে দিয়ে কোন মহিলা গেলে মন্তব্য করতে ছাড়ে না। স্বাভাবিক অবস্থায় তাকে ফুর্তিবাজ বলা যায় না, কিছুটা বোকা ধরণের।

স্বাভাবিক অবস্থায় কথাটা লিখলাম এজন্য যে, হ্যারি লাইমের অন্ত্যেষ্টির সময় যখন তাকে দেখলাম তাই মনে হল।শীতকাল, চারদিকে বরফ পড়েছে, ভিয়েনার কেন্দ্রীয় গোরস্থানে বৈদ্যুতিক যন্ত্র দিয়ে লোকগুলো খুড়ছে। বরফ সরিয়ে দেখে মনে হল প্রকৃতিও হ্যারিকে চায় না। যাইহোক হ্যারিকে কবর দেওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মার্টিন চলে গেল, যেন পালাল। বছর পঁয়ত্রিশের মার্টিন বন্ধুত্বে বিশ্বাসী। পরবর্তীকালে এজন্য প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল। কাউকে একথা সে বলেনি, বললে হয়ত ঝামেলা এড়াতে পারত।

তার সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে। তখন ভিয়েনা, রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের মত বৃহৎ শক্তি কবলিত শহরের মাঝে ইনিয়ার স্টার্ডের বাড়ি আছে। এটি একটি সুইশ বাড়ি, তার অসীম ক্ষমতা। এর নির্দেশে এক মাস অন্তর এক একটা শক্তি ক্ষমতায় আসে, সেই মত কাজ করে। আমার কাছে শহরটা গৌরবহীন

হয়ত এর পিছনে কোন কারণ আছে যা আমার অজানা। সব সময় বরফে ঢাকা শহর। রাশিয়ার অঞ্চল বরাবর ডানিয়ুব নদী নিশ্চল। জনমানবশূন্য চারিদিক, শুধু থাকার মধ্যে ঝোপঝাড়।

সাতই ফেব্রুয়ারী মার্টিন আমার কাছে এসেছিল, এখন শহরের এরকমই অবস্থা। আমি যতটা জানি আর মার্টিনের থেকে যতটা শুনেছি সেভাবেই ঘটনা সাজিয়েছি। এবার সেই গল্প শুরু করব।

.

০২.

রোলো মার্টিন, বার্ক ডেকস্টারের ছদ্মনামে সস্তার পাশ্চাত্য পকেট বুক লিখত। এটা তার পেশা। একবার অস্ট্রিয়ায় ছুটি কাটানোর জন্য সে হ্যারি লাইমের সাহায্য চাইলে হ্যারি তাকে আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু নিয়ে কিছু লিখতে বলে। মার্টিন এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। তবুও শুধু ছুটি কাটাবে বলে হ্যাঁ বলেছিল। মাটিনের মতে হ্যারি ইচ্ছা করলে ব্রিটিশ হোটেল ও ক্লাবের খরচার জন্য স্থানীয় মুদ্রা যোগাতে পারে। সেই আশায় ঠিক পাঁচ পাউন্ড ব্রিটিশ মুদ্রা নিয়ে ভিয়েনার পথে পা বাড়ায়। জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টে এক ঘণ্টার জন্য প্লেন থামলে একটা আমেরিকান রেস্তোরাঁয় ঢুকে সে হামবুগ অর্ডার দিল। কিছুক্ষণ পরই এক সাংবাদিককে তার দিকে আসতে দেখল, লোকটি তার চেনা।

সাংবাদিকটি এসে মৃদু হেসে বলে–আপনি তো মিঃ ডেকস্টার তাই না? একটু ইতস্ততঃ করলেও সে বলে–হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন তো?

–আপনাকে ছবিতে যেমন দেখেছি তার থেকেও অনেক কম বয়সী লাগছে।–

–তাই নাকি? ধন্যবাদ।

–আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

আমি এখন একটু ব্যস্ত।

–বেশী সময় নেব না।

–বেশ, বলুন কি জানতে চান?

–ফ্রাঙ্কফুর্ট সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন।

–একথা আপনি জানতে চাইছেন কেন?

–আমি এখানকার সংবাদপত্রের পত্রকার।

দয়া করে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না এখন, কেননা দশ মিনিট হল এখানে এসেছি।

–তাই যথেষ্ট। তা আমেরিকার উপন্যাস সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দেয় মার্টিন–ওসব আমি পড়ি না।

–পড়েন না? অবাক হয় সাংবাদিকটি।

–না।

ধন্যবাদ।

–আপনার আর কি কোন প্রশ্ন আছে?

–আছে।

তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন।

–আপনাকে তো বেশ রসিক মনে হয়।

–কিসে বুঝলেন? পাল্টা প্রশ্ন মার্টিনের।

নইলে ও কথা বলতে পারতেন না। থাক সে কথা। আচ্ছা, ঐ সামনে ধূসর চুলের, দাঁত উঁচু লোকটি যে খাবার খাচ্ছে তাকে কি আপনার ক্যারী বলে মনে হয়?

ক্যারি? ক্যারির কথা আমায় জিজ্ঞাসা কেন? মুখ কুঁচকে কথাগুলো বলে মার্টিন।

–আমি জে. জি. ক্যারির কথা বলছি।

–জে. জি. ক্যারি?

–হ্যাঁ।

–না, নামতো শুনিনি কখনও।

–শোনেননি?

না।

–অবশ্য সবাইকে সব কিছু শুনতে হবে এমন কথা নেই। আপনারা গল্প লিখিয়েরা কি জগৎ ছাড়া?

-হঠাৎ একথার অর্থ?

সাংবাদিকটি গাড়িতে গিয়ে বলল–আমি কিন্তু লোকটিকে চিনতে পেরেছি।

তা হলে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন কেন? সাংবাদিকটি কোন কথানা বলে তাড়াতাড়ি ঘরটা পার হয়ে ক্যারীর কাছে এগিয়ে গেল। ক্যারী খুশী না হলেও থেমে আহ্বান জানাল।

এদিকে মার্টিন হতাশ হয়ে পড়ল বিমান বন্দরে হ্যারিকে না পেয়ে। এটা তার অচেনা জায়গা, মুদ্রাও নেই। মহা মুশকিলে পড়ে সে, আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে, রাগও হয়। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না, খাওয়া মাথায় উঠেছে, বাইরের দিকে চোখ দিয়ে বসে আছে। মনে মনে ভাবল যদি না আসতে পারে তাহলে একটা খবর রেখে

যাওয়া উচিত ছিল হ্যারির। এখন মনে হচ্ছে, না এলেই ভাল হত।হ্যারি লোভ দেখাল আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু নিয়ে কিছু লিখতে সেও রাজী হয়ে গেল। এখন ফল এই। মার্টিনের মন অভিমানে ভরে ওঠে। কিন্তু অভিমান পুষে রাখতে পারে, হ্যারির বিপদের কথা ভেবে। কোন বিপদ হল, না কি অসুস্থ হয়ে পড়েছে! আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে তার সঙ্গে মজা করছে হ্যারি। মার্টিনের পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। তারা দুজনে একই স্কুলে পড়তো, তবে কেউ কাউকে চিনত না। হ্যারি নিজেই যেচে এসে একদিন আলাপ করেছিল-তোমার নাম কি?

আমার নাম?

–হ্যাঁ, তুমি ছাড়া তো এখানে কেউ নেই।

হেসে বলে বলতে পারি একটা শর্তে।

শর্ত!

হ্যাঁ।

– শর্তটা কি?

–তোমায় আমার বন্ধু হতে হবে।

বন্ধু? আমায়?

হুঁ।

–তা হব।

হবে তো?

বললাম তো। আমার কথা, বিশ্বাস হচ্ছে না?

–না, তা নয়।

–তবে?

–তুমি তিন সত্যি করে বল।

বললাম, এতে হবে না, দিব্যি কাটতে হবে?

না না। ঠিক আছে। এবার আমার একটা কথার জবাব দেবে?

নিশ্চয়ই, বল, কি জানতে চাও?

–তুমি অমন করে দিব্যি কাটলে কেন?

–আসলে...মার্টিন চুপ করে থাকে।

–আসলে কী?

–আমার কোন বন্ধু নেই। আমি ভাব করতে চাই, কিন্তু, সবাই আমায় এড়িয়ে চলে, তাই।

–ওঃ, এই কথা।

–হ্যাঁ।

হ্যারি মার্টিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। বলে–আজ থেকে দুজনে বন্ধু। সব সময় এক সঙ্গে থাকব, আলাদা হবনা কখনো।

মার্টিনও খুশী হয়ে বলে–আমি কথা রাখব।

–তা তো হল, কিন্তু তোমার নামটা এখনো আমায় বলনি।

–আমার নাম রোলো মার্টিন।

কিন্তু আমি তোমায় একটা নাম দেব।

–কি নাম?

–শুধু মার্টিন। তা মার্টিন বলে ডাকলে রাগ করবে না তো?

রাগ? তোমার উপর?

–যদি তুমি আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দাও তাই আগেই জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি।

না, না। এসব ভাবার কোন কারণ নেই, তাছাড়া আমার মা-ও কখনো রোলো, কখনন মার্টিন বলে ডাকত।

যাক, নিশ্চিন্ত হলাম।

–আমার নামটা তো জানলে, তোমার নাম বল এবার।

–সত্যি, অন্যায় হয়ে গেছে।

হ্যারির কথার ধরণ দেখে মার্টিন হেসে ফেলে বলে–খুবই অন্যায় হয়েছে।

–তা কি শাস্তি হবে?

পরে ভেবে বলব। আগে নামটাতো বল।

আমার নাম হ্যারি লাইম।

এত বড় নাম?

যে নামে ডাকতে ইচ্ছে করবে সেই নামেই ডেকো আমার আপত্তি নেই।

ওদের দুজনের বন্ধুত্ব দেখে অন্য ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেও ওদের কিছুই যায় আসেনি। মার্টিনের তোনয়ই, কারণ একরকম বন্ধুত্বের তার বড় অভাব ছিল, এতদিন সেভীষণ কষ্ট করেছে। স্কুলে যেতে ভাল লাগত না, কামাই করত। কিন্তু আজ সে এত খুশী যে আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছিল।

এরপর থেকে সর্বত্র একসঙ্গে দুজনকে দেখা যেত। সত্যি ছেলেবেলার দিনগুলো বেশ ছিল। তখন স্বার্থ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না, তাই সহজেই ঝগড়াও হত ভাবও হত।

আর একদিন, তখন উঁচু ক্লাসে পড়তো, এক ছুটির দিনে হঠাৎহ্যারি মার্টিনের বাড়ি গিয়ে তাকে ডাকতে থাকে। যদিও তার কোন দরকার ছিল না, কেননা সবাই তাকে চেনে। মার্টিন ডাক শুনে বেরতে যাবে তার আগেই হ্যারি তার ঘরে হাজির।

মার্টিন বলে–কী ব্যাপার?

কথা আছে।

–কি কথা?

শিকারে যাবে?

শিকারের নাম শুনে মার্টিনের ভয় হয়, তবুও জিজ্ঞাসা করে, কোথায়?হ্যারি জানে তার স্বভাব, তাই সে আগে জানতে চায় সে রাজী কিনা।মার্টিনআমতা আমতা করে, কিন্তু

যেতেই ইচ্ছা করছে, কেননা ক্লাসের ছেলে রবার্ট বাবার সঙ্গে পিকনিকে গিয়ে মুরগি মেরে পরদিন ক্লাসে এসে ফলাও করে সবাইকে গল্প করছিল।

–আরে, যাবে কি না স্পষ্ট করে বল না? তাছাড়া ভয়ের কি আছে, আমি তো থাকছি।

–ঠিক আছে, রাজী।

থ্যাঙ্ক ইউ। হ্যারি খুব খুশী।

কিন্তু শিকারে গেলে তো বন্দুক চাই।

–হ্যাঁ, সেটা আমার ভাবনা।

–তোমার বন্দুক আছে?

হ্যারি মাথা নাড়ে।

আছে? মার্টিন যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

–হ্যাঁ। হ্যারি হাসে।

কী শিকার করবে?

যা পাব তাই।

–বাঘ ভাল্লুক যদি আসে?

–আসুক, তাও শিকার করব।

–ইস্! আরে, ওসব ওখানে কিছু নেই।

নেই?

না।

–তবে কি আছে?

–খরগোসই বেশী আছে।

–খরগোস? আমায় মারতে দেবে?

নিশ্চয়ই। শিকারে যাবে আর শিকার করতে দেবনা! সেদিন একটা খরগোসও মার্টিনমারতে পারেনি। টিপই নেই তো মারবেকি।তবু সেদিনের আনন্দের কথা আজও স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। এরকম অনেক ব্যাপারে মার্টিন ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও হ্যারি তাকে কখনো ত্যাগ করেনি। যার ফল দীর্ঘ কুড়ি বছরের বন্ধুত্বের অস্ফুট বন্ধন। কিন্তু এখনো হ্যারি না আসায় বিমর্ষ, অভিমানী হয়ে বসে আছে মার্টিন। আসলে প্রকৃত ভালবাসার ধর্ম এই। যাকে বেশী ভালবাসি, তার উপর সামান্য কারণেই রাগ অভিমানের পাল্লা ভারী হয়ে ওঠে।

পাশের ফাঁকা চেয়ারে একজন বসতেই চিন্তায় ছেদ পড়ে। তবু ভরসা সহজে যায় না। ওই মধুর স্মৃতি বুকের অতল থেকে উঠে আসে।

মার্টিন রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে বাস-এর জন্য দাঁড়ায়। বাইরে আবহাওয়া ভারী, আকাশ মেঘলা, একটু আগে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছে। হলেও বোঝা যাবে না, কেন না গুড়ো গুড়ো বরফ পড়ছে। সেই সঙ্গে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়া।

বাস থেকে নেমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল হ্যারির জন্য, কিন্তু আসেনি দেখেই অগত্যা হোটেল অ্যাস্টেরিয়া। সেখানে হোটেল ম্যানেজারকে নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করল–হ্যারি এসেছে? ম্যানেজার মাথা নাড়ে, না।

–কোন খবর কি রেখে গেছে?

না।

আশ্চর্য তো!

তবে ক্রাবিন এসেছিল।

–কে ক্রাবিন?

–তা তো জানি না। আপনি চেনেন না?

–নামই শুনিনি তো চিনব।

–ও আপনার নামে মেসেজ রেখে গেছে।

মেসেজ? আমার নামে?

হ্যাঁ

–আপনার কোন ভুল হচ্ছে না তো?

এতে ভুল হবার কি আছে?

–মেসেজটা আপনার কাছে আছে?

আছে। এই নিন–বলে বার করে দেয়।

ধন্যবাদ।

খুলে দেখে লেখা আছে–আপনাকে আগামীকালের বিমানে আশা করছি। দয়াকরে বর্তমানে যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। আপনার জন্য হোটেলে ঘর বুক করা আছে। চিন্তার কিছু নেই।

কিন্তু রোলো মার্টিন এক জায়গায় বসে থাকার লোকনয়।হঠাৎতার মনেহল এখানে বেশিক্ষণ থাকলে হয়তো কোন ঘটনায় জড়িয়ে পড়বে,সরে পড়াই ভাল।যা মার্টিন হ্যারির

ঠিকানা জানত তাই ক্রাবিনের প্রতি কোন আগ্রহই নেই। সেই সময় একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। হ্যারিকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল–তোমাদের ওখানে গিয়ে কোথায় উঠব?

–কোথায় আবার উঠবে? আমার ফ্ল্যাটে।

–তোমার ফ্ল্যাটে আমার কোন অসুবিধে নেই। তবে...। ।

তবে কি?

–তোমার কোন অসুবিধে হবে না?

–অসুবিধে? তোমার জন্য?

–না যদি...

–এ কথা ভাবলে কি করে?

–অন্যায় হয়ে গেছে। কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।

হয়েছে, আর বলতে হবে না।

হ্যারির ফ্ল্যাটটা ভিয়েনার এক প্রান্তে বেশ বড়। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সে রওনা হল, হ্যারি তার ভাড়া মিটিয়ে দেবে তাই ভেবে। ফ্ল্যাটে পৌঁছে তার কেন জানি মনে হল হ্যারির সঙ্গে দেখা হবে না। চারতলায় পৌঁছে দরজার দিকে তাকাতেই বুঝতে পারল কেন হ্যারি

বিমান বন্দরে যায়নি। হ্যারি আর নেই। বুকের মধ্যে আঁটা ব্যাথা অনুভব করল মার্টিন। যাকে সে মানত, ভক্তি করত, ভালবাসত, যার সঙ্গে স্কুলে রঙিন দিনগুলো কাটিয়েছিল, সে নেই।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মার্টিন দরজার সামনে। কিছুক্ষণ পর পাশের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বলে–আপনি হ্যারির ফ্ল্যাটের বেল টিপছিলেন?

–হ্যাঁ?

–বেল বাজিয়ে লাভ নেই।

–এ কথা বলছেন কেন? মার্টিন যেন কুঁকড়ে ওঠে।

–ফ্ল্যাটে কেউ নেই। হ্যারি মারা গেছে।

মার্টিন আর্তনাদ করে ওঠে।

–একটা দুর্ঘটনায়...।

মার্টিন বিস্মিত, ভাবে লোকটি বোধহয় ঠাট্টা করছে। কিন্তু মৃত্যু নিয়ে কেউ তো ঠাট্টা করবে না। লোকটি বলে বুঝতে পারছি আপনার মেনে নিতে অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু সত্যি কথা।

–তা তো ঠিকই। তবু মানতে পারছি না।

–আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব যদি কিছু মনে না করেন?

-না, না। মার্টিন নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে। তার ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, মাথায় যেন সহস্র বোলতা দংশন করছে। কাঁদতে চাইছে কিন্তু পারছে না।

–একটা কথা জিজ্ঞাসা করি?

–আঁ! চমকায় মার্টিন।

–নিশ্চয়ই হ্যারি লাইমের কথা ভাবছেন, ভাবাই স্বাভাবিক। আচ্ছা উনি কে হন আপনার?

–ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। দীর্ঘ কুড়ি বছরের পরিচয়।

কুড়ি বছর?

–হ্যাঁ।

-তাই আপনি মানতে পারছেন না। হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় বিশেষ করে প্রিয়জনের ক্ষেত্রে তো বটেই।

মার্টিনের মুখ থেকে যেন বেরিয়ে এলেন–আচ্ছা আপনি ঠাট্টা করছেন না তো?

-ঠাট্টা? আমি? আপনার সাথে?

–হ্যাঁ।

হঠাৎ এ কথা ভাবার কারণ? কথার সুরে রাগ বোঝা যাচ্ছে।

–আছে।

সঙ্গত কারণ আছে?

–হ্যাঁ।

–তা কারণটা জানতে পারি কি?

–অবশ্যই। অনেকে বিদেশী পেয়ে পরিহাস করতে চায়। আপনার কাছে যেটা ঠাট্টা সেটা আমার কাছে মৃত্যুর সমান হতে পারে, সেটা বোঝার চেষ্টা করুন।

–আমি ওসব তত্ত্ব কথা বুঝি না।

–বোঝেন না?

–না।

–তাহলে কিছু বলার নেই।

–আপনি কি একজন বিদেশী?

–হ্যাঁ।

–কোথা থেকে আসছেন?

–আজই ইংল্যান্ড থেকে আসছি।

–আপনি বিদেশীহলেও এ ব্যাপার নিয়ে কেউ ঠাট্টা করে না আমিও করছিনা। বিশ্বাস করতে পারেন।

আপনি কি রেগে গেলেন?

না না। আমিও তো মানুষ। আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি, এ সময় অনেকেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। আমিও আমার দাদা...। যাক সে কথা।

মার্টিন যেন আর অবিশ্বাস করতে পারল না। তার পা টলছে, শরীরে এক বিন্দু যেন শক্তি নেই। শেষ বারের মত তার সঙ্গে কথাও বলতে পারল না। এভাবে হট করে চলে গেল। যদি জানত অসুস্থ ছিল মারা গেছে তা হলেও কিছুটা সান্ত্বনা পেত কিন্তু এ তো বিনা মেঘে বজ্রপাত। মার্টিন লোকটাকে বলে–আমায় একটু বসতে দিতে পারেন।

–আপনি এ বেঞ্চটায় বসুন।

ধন্যবাদ।

হঠাৎ মার্টিনের হ্যারির কিছু কথা মনে পড়ে। তখন তারা ক্লাস নাইনে পড়ে। দুজনে শিকারে গিয়েছিল। অনেক খরগোস মেরেছিল হ্যারি। তা দেখে মার্টিন বলেছিল–তোমার বন্দুকের হাত তো দারুন।

–তোমার হাতটাও মন্দ নয়।

–কী যে বলো তার ঠিক নেই।

–একটা খরগোস মার নি?

–সে তো তিনবারের পর।

–আস্তে আস্তে হবে।

–যার নয়তে হয় না তার নব্বই-তেও হয় না।

বাঃ বেশ বললে তো কথাটা।

–আমার কি মনে হচ্ছে জান?

–কি?

–তুমি বড় হয়ে একজন ইঞ্জিনীয়ার হবে।

ইঞ্জিনীয়ার! হ্যারি হাসে। –

-হ্যাঁ, নয়তো ডাক্তার।

হঠাৎ আমার সম্বন্ধে এরকম ধারণার কারণ?

কারণ না থাকলে কি এমনি বলছি?

–সেটাই তো জানতে চাইছি।

–যার হাত এত ভাল সে এরকম একটা কিছু না হয়ে যায় না।

–কিন্তু বন্ধু একটা কথা ভুল না।

–কি?

–তারজন্য লেখাপড়ায়ও ভাল হওয়া চাই।

–তুমি লেখাপড়ায় এমন কিছু খারাপ নও।

–দেখলে তো? তুমি ঠিক একথা বলতে পারলে না। সত্যি এভাবেই মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। আর তুমি তো আমার থেকে লেখাপড়ায় ভাল।

তা অস্বীকার করছি না। তবে তুমি যা আছ তাতেই হবে। তাছাড়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরও দরকার। সে দিক দিয়ে তুমি এগিয়ে।

–কিন্তু আমার ভাগ্যে ওসব হয়ত কিছু হবে না।

–দেখ, ঠিক হবে।

–কিন্তু...।

কিন্তু কি?

মনে হচ্ছে আমার অপঘাতে মৃত্যু হবে।

অপঘাতে মৃত্যু? তোমার?

হ্যাঁ।

হঠাৎ একথা কেন বলছ?

–জানি না। হঠাৎ মনে হল তাই বললাম।

–ওসব অলক্ষুণে কথা কখনো বলবে না। আর এটা তোমার মনে হলই বা কেন?

–মন তো সব সময় নিজের দখলে থাকে না। তাই ও কখন কি ভাবে তা কি করে বলব?

—তবুও আমার সামনে অন্তত এসব বলবে না।

–তাই হবে।

–মনে থাকবে তো?

–মনে রাখার চেষ্টা করব।

মার্টিন ভাবে শেষে হ্যারির কথাই সত্যি হল। সত্যি দুর্ঘটনায় মারা গেল। কি করে ওর কথা জানল?

এখন একটু মদ পেলে ভাল হত। অন্ততঃ সব কিছু কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকা যেত। কিন্তু পকেট তো খালি। ভগবান সব দিক দিয়ে যেন আজকে পিছনে লেগেছে।

–মিঃ...।

—অ্যাঁ। সম্বিত ফিরে পায় মার্টিন–আমায় কিছু বলছেন?

–কি ভাবছেন?

–কি আর ভাবব? ভাবার কিছু নেই, কবে এই ঘটনা ঘটল?

বৃহস্পতিবার।

–কি করে?

–গাড়ি চাপা পড়ে। আজ সন্ধ্যাবেলা তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। একটু আগে এলে তাদের আপনি দেখতে পেতেন।

তাদের মানে?

–মানে হ্যারির বন্ধু বান্ধবদের কথা বলছি।

–হ্যারিকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল?

–না। তাছাড়া কোন লাভ হত না।

-কেন?

কাঁধে জিপ গাড়ির মাডগার্ডের প্রচণ্ড আঘাত লাগায় খরগোসের মত রাস্তায় ছিটকে পড়েছিল। তাতেই মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু ঘটে।

খরগোস কথাটা এভাবে ব্যবহার করবে ভাবতে পারেনি মার্টিন। সহসা হ্যারি যেন তার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠল।

হ্যারিকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে?

-কেন্দ্রীয় কবরস্থানে।

-ঠিক আছে চলি। অনেক ধন্যবাদ–আস্তে আস্তে নিচে নেমে যায় মার্টিন। পয়সা না থাকলেও নীচে দাঁড়ান ট্যাক্সিতে উঠে চালককে কেন্দ্রীয় কবরস্থানে নিয়ে যেতে বলে। সীটের ওপর। ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দেয়, ভাবে কপালে এই ছিল। এখন কি হবে? মাত্র পাঁচটা মুদ্রা নিয়ে ভিয়েনায় কোথায় থাকবে।

কবরখানার চারদিকে উঁচু পাঁচিল। পাশ দিয়ে ট্রাম লাইন গেছে। রাস্তার অন্যদিকে বড় বড় বাড়ি, বাজার। এতবড় কবরখানা সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না তার। সেখানে প্রবেশ করে কিছুটা এগিয়ে ডান দিকে গেল। কবরখানাতেও চারটে বৃহৎশক্তি অঞ্চল চিহ্নিত। রাশিয়ার অস্ত্রে সজ্জিত মূর্তি, ফ্রান্সের ক্রশ ঘেঁড়া পতাকা। মার্টিনের মনে পড়ে হ্যারি তো ক্যাথলিক। হঠাৎ গাছের তলা দিয়ে তিনজন বেরিয়ে এল। পরনে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাজ পোশাক। যীশুর উদ্দেশ্যে ঐশ করতে করতে বেরিয়ে গেল।কিছুক্ষণ পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জায়গা দেখা গেল। একটা বিরাট পার্কের এক জায়গায় বরফ পরিষ্কার করা হয়েছে। চারপাশে লোক, একজন পুরোহিত বিড়বিড় করে কি বলে চলেছে। একটা মেয়ে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে চোখে হাত চাপা দেওয়া। আমি প্রায় কুড়িগজ দূরে দাঁড়িয়ে, মার্টিন আমার দিকে তাকাল ভাবল কোন অপরিচিত, কেননা গায়ে বর্ষাতি। আমায় এসে জিজ্ঞাসা করল–যাকে কবর দেওয়া হল তাকে চেনেন?

-হ্যাঁ।

–ওর নাম কি?

–হ্যারি লাইম।

নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখি চোখ দিয়ে জল পড়ছে। অথচ দেখে মনে হয়েছিল সহজে ভেঙে পড়ার লোক নয়। এখানে একটা কথা বলা অনুচিত তবু বলছি, হ্যারির মত মানুষের জন্য সত্যিকারের শোক করার কোন লোক থাকতে পারে বলে জানা ছিল না।

মার্টিন শেষ পর্যন্ত আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। আমি জিজ্ঞাসা করি–আপনি হ্যারির কে হন?

–বন্ধু।

বন্ধু? অনেকদিনের আলাপ?

–হ্যাঁ, সেই স্কুল থেকে।

–এরা হ্যারির বন্ধু। আপনি এদের সঙ্গে পরিচয় করবেন?

–না, থাক্।

কবর দেওয়া শেষ হলে সে ট্যাক্সির দিকে চলল একটা কথা বোধহয় সকলেই জানেন কোন লোকের ওপর ফাইল লেখা কখনো শেষ করা যায় না। এমনকি মারা গেলেও একশ বছর পরও বন্ধ করা যায় না। সুতরাং আমি মার্টিনকে অনুসরণ করলাম।

তিনজনকে চিনতাম, মার্টিন চতুর্থ এবং নতুন। তাই তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে বললাম আমি সঙ্গে গাড়ি আনিনি। আপনি দয়া করে আমায় একটু শহরে পৌঁছে দেবেন?

নিশ্চয়ই।

আমি মার্টিনের সঙ্গে গেলেও আমার গাড়ি পিছনেই আসছে। এটা আমার চালকের জানা। গাড়ি চলতে শুরু করল, কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মার্টিন জিজ্ঞাসা করল না তাকিয়েই আপনার নাম কি জানতে পারি?

–আমার নাম ক্যালাও। এবার আপনার নাম যদি দয়া করে বলেন।

–রোলো মার্টিন।

–আপনি তো হ্যারি লাইমের বন্ধু ছিলেন, না?

–হ্যাঁ।

–অথচ গত সপ্তাহে একথা স্বীকার করতে অনেকে চাইত না।

কেন বলুন তো?

–সে কথায় পরে আসছি, আচ্ছা আপনি কি এখানে অনেকক্ষণ এসেছেন?

–আজ বিকেলে ইংল্যান্ড থেকে এসেছি।

ও।

-হ্যারি আমায় এখানে থাকার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল। কিন্তু দেখা পেলাম না।

–সত্যি খুব দুঃখ পেলেন।

–হ্যাঁ, ভীষণ।

এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলে–আমায় একটু মদ খাওয়াতে পারেন, আমার কাছে টাকা নেই শুধু পাঁচ পাউন্ড ব্রিটেনের মুদ্রা রয়েছে। আর এখন মদ খুব দরকার, পেলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

নিশ্চয়ই, একটু ভেবে স্ট্রাকের একটি ছোট পানশালায় চালককে যেতে বললাম। এখানে ভীড় কম, শুধু বনেদীরাই আসে কেননা পানীয় মূল্য অনেক। পানশালায় ঢুকে একটি কেবিনে বসলাম। পাশের কেবিনে এক দম্পতি। তাছাড়া কেউ নেই। আমার পরিচিত বেয়ারা এসে কিছু স্যান্ডউইচ আর মদ রেখে চলে গেল। মার্টিন দুটো পেগ শেষ করে বলল-হ্যারি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিল। এ দুঃখ সহজে ভুলতে পারবনা।আমি কোন জবাব দিলাম না। ভাবলাম এ মুহূর্তে তাকে খুঁচিয়ে কিছু কথা জানা দরকার তাই বললাম–এ যে সস্তা দরের উপন্যাসের সংলাপ বললেন।

সস্তা দরের উপন্যাসের সংলাপ? ঠিকই বলেছেন।

কারণটা জানতে পারি কি?

–আমি যে ওসবই লিখি।

এবার আপনাকে একটা অনুরোধ করব।

বলুন।

–হ্যারির সম্বন্ধে, আপনার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

–আমি আরও মদ চাই, আমি ওকে ভুলতে পারছি না। তাছাড়া আপনি অপরিচিত, বেশী বিরক্ত করতে চাই না। শুধু দু এক পাউন্ড ব্রিটিশ মুদ্রা অস্ট্রিয়ান টাকায় ভাঙিয়ে দেবেন?

-ওসব নিয়ে চিন্তা করবেননা। আমি সেখানে ছুটি কাটাতে গেলে এভাবে শোধ করে দেবেন।

কাজের কথায় চলে আসি, প্রশ্ন করি–হ্যারির সঙ্গে প্রথম পরিচয় কবে?

কথার উত্তর না দিয়ে মদের গ্লাসটা ঘুরেফিরে দেখতে থাকে তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে–হ্যারিকে আমি যতটা জানি আর কেউ জানে না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

কতদিন হবে?

দীর্ঘ কুড়ি বছর তো বটেই। স্কুলে একসাথে পড়তাম। সব যেন চোখের সামনে ভাসছে। সহজে ভোলা যায় না। স্কুলের দিনগুলো বড় মধুর দায়দায়িত্বহীন সময়।

একটু থেমে আবার বলে–একথা ঠিক, আমার চেয়ে এক বছরের বড় ছিল হ্যারি। ওর মত বুদ্ধিমান কাউকে দেখিনি, এর জন্য অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচেছি এবং সে জন্য কৃতজ্ঞ। তার মত লোক আমি দেখিনি। হ্যারি হ্যারিই, ওর তুলনা ও নিজেই।

–আচ্ছা, পড়াশুনায় কি খুব ভাল ছিল?

না, তা ঠিক নয়। তবে বুদ্ধি ছিল প্রচণ্ড।

ওর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে আমায় নাজেহাল হতে হয়েছে অনেকবার।

—আর কি?

–ও নিখুঁত ভাবে বেরিয়ে আসতে পারত, কেননা উপস্থিত বুদ্ধি, যেটা অনেকের থাকে না। এজন্য ওকে আলাদা চোখে দেখতাম, গর্বও বোধ করতাম।

কথা শেষ করে মার্টিন হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে। ভাবলাম হ্যারির শোক কিছুটা কাটিয়ে উঠছে। মার্টিন রসিকতা করে বলে, আমি কিন্তু সব সময়ই ধরা পড়ে যেতাম। ওর তুলনায় বোকাই। আমি বলি–এতে হ্যারির সুবিধে ছিল।

–সুবিধে ছিল?

–হ্যাঁ।

–কী আজে বাজে বকছেন? চেঁচিয়ে ওঠে মার্টিন। পাশের কেবিনের কথা থেমে যায়।

–আমার তো তাই মনে হয়।

–আপনার তো অনেক কিছুই মনে হতে পারে তাতে আমার কিছু আসবে যাবেনা। ও ইচ্ছে করলে আমার থেকে চতুর কাউকে নিতে পারত কিন্তু তা করে নি। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিত। আমায় ভীষণ ভালবাসত ও।

–আপনি হ্যারিকে শেষ কবে দেখেছেন?

কবে? দাঁড়ান ভেবে বলছি। কিছুক্ষণ পর বলে চিকিৎসকের সম্মেলনে যোগ দিতে মাস দুয়েক আগে ওখানে গিয়েছিল। জানেন তো ও চিকিৎসক ছিল, তবে আশ্চর্যের বিষয় কখনও প্র্যাকটিস করত না।

–প্র্যাকটিস করতো না?

–না।

–আবার বলছেন চিকিৎসক।

–ওটাই তো মজার ব্যাপার।

–কোন কারণ ছিল কি?

–ছিল তো বটেই। কোন কিছু সম্বন্ধে জানা হয়ে গেলে সে ব্যাপারে একেবারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলত। কেমন যেন নির্লিপ্তভাব।

-কেন বলুন তো?

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

বড় অদ্ভুত মানুষ তো!

–তবে সে প্রায়ই বলত, ডাক্তারিটা মাঝে মধ্যে কাজে লাগে। এর দৌলতে কিছু করা যায়। শুনে আমারও মনে হত কথাটা ঠিক।

আমি মার্টিনের কাছ থেকে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছি। মার্টিন বলে–ও বেশ রসিক মানুষ ছিল। ইচ্ছে করলে এই কাজেও প্রচুর সুনাম অর্জন করতে পারত। অবশ্য এটা আমার ধারণা।

-তাই নাকি?

–হ্যাঁ। হঠাৎ শিস দিয়ে একটা গানের সুর বাজায় মার্টিন। আমার চেনা চেনা লাগে সুরটা। বলে এ সুরটা আমি কখনো ভুলব না।

-কেন?

–এটা হ্যারি সব সময় গাইত। কিন্তু আমি ভাবতে পারছি না ও এভাবে মারা গেল কি করে? একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মার্টিন।

এভাবে মৃত্যু তার পক্ষে ভালই হয়েছে।

–তাই নাকি?

–হ্যাঁ।

তার মানে কোন কষ্ট পায়নি?

-সেদিক দিয়ে তাকে ভাগ্যবান বলতে হবে। মার্টিনকে দেখে মনে হল নেশা হয়েছে। আমার গলার স্বরে সচকিত হয়ে আস্তে আস্তে বলল–আপনি তার সম্বন্ধে কি জানতে চাইছেন?

–কিছুই না।

দেখি তার ডান হাত মুঠো করা,বলি–সব অবস্থায় গায়ের জোর দেখিয়ে লাভ নেই। মার্টিনের হাতের কাছ থেকে আমার চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে বললাম–হেড কোয়ার্টারের নির্দেশ মত ওর তদন্তের কাজ আমি শেষ করেছি। বলে, প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকি। দেখি হাতটা তখনো বন্ধ।

-কী শেষ করেছেন? ওর মত মানুষ হয়না। ও যে আমার হ্যারি।

–তা হতে পারে। তবে আমি অনেক কিছু জেনেছি।

কী জেনেছেন?

–এই দুর্ঘটনা না ঘটলে ওকে জেলে পচতে হত।

জেলে? পচতে হত? কী বাজে কথা বকছেন?

–আজে বাজে নয়, ঠিকই বলছি।

–ঠিকই বলছেন? তা কারণটা দয়া করে বলবেন কি?

–সে এই শহরের খুব বাজে ধরনের লোক ছিল।

—বাজে লোক? হ্যারি?

-হ্যাঁ।

–আপনার মাথা ঠিক আছে তো?

–তাই তো মনে হচ্ছে।

তবু একবার ডাক্তার দেখিয়ে নেবেন।

উপদেশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

–ঠাট্টা করছেন?

ঠাট্টা আপনাকে?

–আমার তো তাই মনে হচ্ছে। না হলে ও কথা বললেন কী করে? মার্টিনের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি।

না না। আপনার সঙ্গে কি আমার সেই সম্পর্ক?

–নেই বলেই তো জানি।

মনে হল মার্টিনকে অস্বাভাবিক, আক্রমণাত্মক। আমি সচকিত হলাম তবে আমাকে কিছু করতে পারবেনা। খুব বেশী হলে পানশালার পরিবেশটা অন্যরকম করে ফেলবে। লজ্জার ব্যাপার হলেও এখানকার ম্যানেজার আমায় ক্ষমা করে দেবে কেন না আমায় চেনে।

মার্টিন প্রশ্ন করে আপনি কি পুলিশের লোক?

–হ্যাঁ। মাথা নেড়ে বললাম।

–আমি ওদের ঘৃণা করি।

–ঘৃণা করেন?

–হ্যাঁ।

কারণটা জানতে পারি কি?

–নিশ্চয়ই। পুলিশরা অত্যাচারী।

–প্রয়োজনে হতে তো হয়ই।

–অপ্রয়োজনেও হয়।

বাজে কথা।

–মোটেই না। আর অভিযোগ করলে আপনারা শোনেন। পুলিশ বলে কথা।

–একথা মানতে পারছি না।

–মানা না মানা, আপনার ব্যাপার। আর বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনারা বোকা।

–বোকা? হঠাৎ এ রকম মন্তব্য?

–অনেক-অনেক কারণ আছে।

–যেমন!

আপনি এ ধরণের বই লেখেন? তাকিয়ে দেখি মার্টিন হিংস্র মুখে চেয়ার দিয়ে আমাকে আগলাতে চেষ্টা করছে। একজন বেয়ারার চোখে চোখ পড়তেই বুঝিয়ে দিই এখন আমার কি ধরণের সাহায্য প্রয়োজন। এই পানশালায় আমার এটাই একটা সুবিধে।

বেয়ারাকে এগিয়ে আসতে দেখে মার্টিন নিজেকে সংযত করে, বলে–আমার বইতে জমিদারের চরিত্র ঠিক এরকম ধরণের।

একথার আমি কোন জবাব না দিয়ে বলি–আপনি কি আমেরিকায় ছিলেন?

না। এটাও কি পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদ।

–উঁহু। শুধু কৌতূহল নিবারণের জন্য।

কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি হ্যারির সঙ্গে আমায় জড়াতে চাইছেন। কিছুতেই হতে দেব না।

–আমার মনে হয়না হ্যারি আপনার মত লোককে দলে টানতে চেয়েছিল।

পেট্রলের চোরা কারবারে কাউকে ধরতে না পেরে হ্যারির ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে।

যা সাধারণ পুলিশরা করে থাকে।

–আমি কর্নেল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে আসছি। মার্টিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি, বেশ উত্তেজিত।

আমি বলি দৃঢ়তার সঙ্গে–কোন পেট্রলের ব্যাপার নয়।

–তাহলে? টায়ারের?

–তাও নয়।

-তবে সাকারিনের ব্যাপার? তা দু একজন নির্দোষীকে ছেড়ে প্রকৃত খুনীকে ধরার চেষ্টা করুন কাজের হবে।

–আপনার কথা মনে রাখব।

ধন্যবাদ।

–কিন্তু একটা কথা কি জানেন?

–কি কথা?

–খুন করাও হ্যারির আওতায় পড়ত।

–খুন জখমও হ্যারি করত।

বলে হঠাৎই মার্টিন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার ড্রাইভার ছুটে এসে ওকে ধরে ফেলে। দেখে ড্রাইভারকে বললাম, ও একজন লোক। মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছে, ও কিছু নয়।

মার্টিন বলে ওঠে-শুনুন মিঃ ক্যালামান...।

–আমি ক্যালামান না, ক্যালাও। কি বলবেন বলুন।

–আপনার দুর্ভাগ্যের শেষ থাকবে না।

–এটা আপনার কোন গল্পের ডায়লগ?

–আমাকে অপরাধী করতে চাইছেন। আমি এবার যেতে চাই মিঃ ক্যালামান।

এখন আপনাকে মেরে কদিন শুইয়ে রাখতে পারতাম জানেন?

চেষ্টা করে দেখবেন নাকি?

–সেটা করতে চাই না।

–আপনার অসীম করুণা বলতে হবে।

তবে আপনাকে শেষ পর্যন্ত ভিয়েনা ছাড়তে হবে।

মুখ বিকৃত করে মার্টিন বলে–তাই নাকি?

মার্টিনের কথায় কোন আমল না দিয়ে কিছু টাকা ওর পকেটে গুঁজে দিয়ে বললাম–আশা করি আজকের রাতটা কোন অসুবিধে হবে না। তবে কাল ভোরের প্লেনে লন্ডনের জন্য সীট বুক করে রাখার চেষ্টা করব।

মার্টিন এতক্ষণ চুপ ছিল এবার বলে–তাই নাকি?

–হ্যাঁ

—ও ভয় আমাকে দেখাবেন না।

–ভয়? আপনাকে?

আপনার কথা শুনে তো তাই মনে হচ্ছে।

–এটা আমার মতামত।

–মানতে পারছি না। আমার এখানে আসার যাবতীয় কাগজপত্র ঠিক আছে।

–ঠিক আছে তাই তো?

–হ্যাঁ।

–ভাল কথা।

–শুনে খুশী হলাম।

–অন্য শহরের মত এখানেও টাকার দরকার হয়।

জানানোর জন্য ধন্যবাদ।

কালোবাজারে ব্রিটেনের পাউন্ড ভাঙাতে দেখলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে গ্রেপ্তার, করব।

–আমাকে?

–হ্যাঁ।

ড্রাইভারের হাতে ধরা মার্টিনকে এবার ছেড়ে দিতে বললাম। ছাড়া পেয়ে মার্টিন সোজা হয়ে দাঁড়াল পানীয়র জন্য ধন্যবাদ।

–ঠিক আছে।

তবে আমার মনে হয় এ খবর সরকারের আওতায় পড়ে।

–হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন।

আশা করছি দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার আমাদের দেখা হবে।

–এত দেরী করে?

—আপাতত তাই।

কাল চলে যাবার সময় দেখা হবে।

চলে যাবার সময়?

–হ্যাঁ।

–শুধু শুধু কষ্ট করে বিমান বন্দরে যাবেন না কেননা কাল আদৌ যাচ্ছি না স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। আমার এখানে অনেক কাজ আছে।

পরের কথা পরে হবে। এখন হোটেলে যান খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করুন।

ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।

মার্টিনসহসাআমার দিকে ঘুষি চালাল। কোনরকমেমাথাসরিয়ে নিজেকেবাঁচালাম।ড্রাইভারের আঘাতে মার্টিন মেঝেতে ছিটকে পড়ল। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে। মার্টিনকে বললাম, একটু আগে বলেছিলেন, কোনরকম মারামারি করবেননা। মার্টিনরাগে গজগজ করতে করতে ক্ষতস্থান মোছে। হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসতে বললাম ড্রাইভারকে, আমি একটু পানীয় নিয়ে বসলাম।

.

০৩.

পেইন অর্থাৎ আমার ড্রাইভার এর কাছ থেকে নয়, পরবর্তী ঘটনা শুনেছি রোলো মার্টিনের থেকেই।

হোটেল পৌঁছে ম্যানেজারকে আমার নাম করে পেইন বলে এই ভদ্রলোককে একটা ঘর দিতে হবে। মার্টিন এলে ম্যানেজার তাকে জানাল তার ঘর বুক হয়ে আছে। ঘরটা কতদিনের জন্য আছে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারে এক সপ্তাহের জন্য। হঠাৎ পাশ থেকে একজন বলে ওঠে বিমান বন্দরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারিনি বলে দুঃখিত। নিশ্চয়ই খুব অসুবিধা হয়েছে।

–তা একটু হয়েছে।

–আমার নাম ক্রাবিন। হেড কোয়ার্টার থেকে ভুল বার্তা এসেছিল। আমার চেনা একজন লোক, আপনি এসেছেন বলতে সঙ্গে সঙ্গে বিমান বন্দরে যাই।

–আপনি গেছিলেন নাকি?

–হ্যাঁ, কিন্তু ততক্ষণে আপনি চলে গেছেন। আচ্ছা খবরটা হোটেল থেকে পেয়েছেন তো?

–হ্যাঁ।

–মিঃ ডেকস্টার, আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে খুব খুশী আমি।

ধন্যবাদ।

–ছেলেবেলা থেকে আপনাকে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের আসনে বসিয়েছি আমি। আফ্রিকার অগণিত পাঠকের কাছে আপনি প্রিয়। তবে বিষাক্ত ছোবল বইটা আমার সব থেকে ভাল লাগে।

মার্টিন অন্য চিন্তা করছিল, বলে–এখানে কি এক সপ্তাহ থাকতে পারব?

–হ্যাঁ পারবেন।

–অনেক ধন্যবাদ।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে মার্টিন বলে–যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

না, না, মনে করার কি আছে? বলুন কি জানতে চান।

–আমার এখানকার খাবার বিল কে দেবে?

–মিঃ স্মিড।

মিঃ স্মিড? ভাল কথা।

আপনার হাত খরচের জন্যও টাকা দরকার।

–ঠিকই ধরেছেন।

–এটা আমিই দেব।

বেশ ভাল।

–মনে হয় কাল একান্তে কাটাবেন।

–হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন।

–কোথাও যদি বেরোবার হয় কাল জানাবেন।

নিশ্চয়ই।

–ও একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।

–কি কথা?

–পরশুদিন এখানকার এক সভায় উপন্যাসিকদের নিয়ে আলোচনাচক্র বসবে। আপনি সভাপতি হলে ভীষণ খুশী হব।

মার্টিন সানন্দে রাজী হয়ে যায়, কেননা তার মুক্তি দরকার।

পরে আমি জানতে পারি, সুরা, নারী, উত্তেজনা এসবের প্রতি তার দুর্বলতা আছে।

প্রথম থেকে মার্টিনের মুখে রুমাল চাপা থাকায় জাবিন কিছুটা বিনয়ের সুরে এবার বলে মিঃ ডেকস্টার আপনার দাঁতে কি ব্যাথা? আমার একজন ভাল দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় আছে।

-না, আঘাত লেগেছে।

–হায় ভগবান। ছিনতাইকারীদের হাতে পড়েছিলেন নাকি?

–না-না।

–তাও ভাল।

–একজন সৈনিকের হাতে পড়েছিলাম।

–সৈনিক? খুব বদরাগী বোধহয়?

—আমি ওর কর্নেলগিরি ঘুচিয়ে দিলাম।

–দেখি কোথায় লেগেছে।

ক্ষতস্থান দেখে ক্রাবিন হকচকিয়ে যায়, কিছু বলে না। মার্টিন পরিস্থিতি সহজ করতে চায়, বলে–নির্জন আরোহী বইটা পড়েছেন?

-বোধহয় না।

–নির্জন আরোহীর সবথেকে প্রিয় বন্ধুকে এক জমিদার গুলি করে মেরেছিল, আর সে আইনের সাহায্যে নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছিল। গল্পটা এই।

–আমি ভাবতে পারিনি এধরণের পশ্চিমী উপন্যাসগুলো আপনি পড়েন।

–আমি কর্নেল ক্যালামিনের পিছনে ঠিক এইভাবে লাগব।

–আচ্ছা এই কর্নেল লোকটি কে?

তার আগে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বলুন।

–হ্যারী লাইমকে চেনেন?

হ্যাঁ। তবে.....।

–তবে কি?

খুব ভাল করে চিনি না।

–সে ছিল সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু আমার।

–আমার মনে হয় না সাহিত্যের চরিত্রের সঙ্গে তার মিল থাকবে।

না মিল নেই।

–আপনি একটা কথা জানেন কিনা জানি না হ্যারি লাইমের থিয়েটারের সখ ছিল।

থিয়েটারে ঝোঁক?

–তাই তো মনে হয়।

–কেন?

মাঝে মধ্যে একজন অভিনেত্রী বন্ধুকে নিয়ে আসত সে।

বয়স কত?

বেশ অল্পই।

—তবু।

কুড়ি বাইশ হবে।

–অভিনয় কেমন করে?

— কাঁচা একেবারে।

মার্টিনের হঠাৎ কবরস্থানের মেয়েটির কথা মনে পড়ে।বলে–আমি হ্যারির কোন বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হতে চাই, যদি সাহায্য করেন।

নিশ্চয়ই। তা এই মেয়েটির সঙ্গে পরিচিত হবেন?

–আমার কোন আপত্তি নেই।

–সেই মেয়েটিকে হয়ত সভায় দেখতে পাবেন।

–মেয়েটি কি অস্ট্রিয়ান?

–যদিও নিজেকে তাই বলে, তবে আমার স্থির বিশ্বাস ও অস্ট্রিয়ান নয়।

কি হতে পারে?

—ও হাঙ্গেরীয়ান। হ্যারিই সম্ভবতঃ ওকে কাগজপত্র ঠিক করে দিয়েছিল।

–মেয়েটির নাম কি?

বলছি বলে ভাবতে থাকে ক্রাবিন।

ও নিজেকে আন্না স্মিড বলে।

মার্টিনের মনে হল আর কিছু জানার নেই, তাই বলে–আমি ভীষণ ক্লান্ত, এবার বিশ্রাম করব। কাল ভোরে আপনাকে ফোন করব।

-ঠিক আছে। যাবার আগে কিছু পাউন্ড মার্টিনকে দেয় ক্রাবিন। মার্টিন জানতে চায় কত পাউন্ড। উত্তরে জানায় ক্রাবিন,দশ। এরপরে ক্লান্ত মার্টিন কখন ঘুমের মধ্যে ভিয়েনার স্বপ্ন দেখতে থাকে নিজেই জানেনা। দেখে বরফের মধ্যে পা ঢুকিয়ে হাঁটছে। পাচা ডাকছে, হ্যারির মত একজন কাউকে দেখা গেল। আবার প্যাচাটা জোরে ডেকে উঠতে ঘুম ভেঙে যায় মার্টিনের। শুনতে পায় ফোন বেজে চলেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিসিভার তুলে সাড়া দিল। ও প্রান্তে অপরিচিত কণ্ঠস্বর বলে উঠল, আপনি কি রোলো মার্টিন?

–আপনি কে বলছেন?

–আমায় চিনবেন না।

–তবু পরিচয়টা দিলে ভাল হত।

–আমি হ্যারি লাইমের বন্ধু।

–আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে খুশী হব। আপনি কোথায় থাকেন?

–পুরানো ভিয়েনার মোড়ের মাথায়।

—আমাদের সাক্ষাৎটা কাল করলে ভাল হয়। আজ আমি ভীষণ ক্লান্ত।

–ও, আচ্ছা। আচ্ছা। হ্যারি মারা যাবার আগে আমায় অনুরোধ করেছে যেন এখানে আপনার কোন অসুবিধে না হয় তা দেখতে?

মার্টিন ভাবল, তার তো কথা বলার মত অবস্থা ছিল না। তাহলে, মনে হল কেউ যেন তাকে, সাবধান করে দিল। তাই প্রসঙ্গ বদলাল মার্টিন।

–আপনার নামটা কিন্তু এখনো জানা হল না।

আমার নাম কার্টস। আমি আপনার কাছে যেতাম কিন্তু ঐ অঞ্চলে অস্ট্রিয়ানদের প্রবেশ নিষেধ।

-তাহলে কাল আমাদের পুরনো ভিয়েনায় দেখা হতে পারে।

— ঠিক আছে। কাল অবধি কোন অসুবিধে হবে না তো?

হঠাৎ এ কথা কেন বলছেন?

–মানে হ্যারি বলেছিল আপনার হাতে টাকা পয়সা নেই, তাই। অন্যকিছু ভেবে জিজ্ঞাসা। করিনি।

এখন আমার কোন রকমে চলে যাবে। হ্যারি ঠিকই বলেছিল, আমার প্রকৃত বন্ধু ছিল ও।

–আমি সে জন্যই...।

–অনেক ধন্যবাদ।

না, না, এতে ধন্যবাদের কি আছে। ফোন রাখি তাহলে।

–ঠিক আছে।

মার্টিন ভাবে ভিয়েনায় আমার এই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ইনি তৃতীয় ব্যক্তি যে টাকা দিতে চাইছে। মার্টিন রিসিভারনামায় নি,অপরপক্ষও বোধহয় তাই, নাহলেহঠাৎ শুনলকাল সকালে আমাদের দেখা হবে কি?

–সকালে? কটায়?

–এগারটা।

–কোথায়?

–স্ট্রসের পুরনো ভিয়েনায়।

–আপত্তি নেই। ভাল কথা, আপনাকে চিনব কি করে?

–সে ব্যবস্থা করে রেখেছি।

–যেমন?

বাদামী স্যুট পরে থাকব আমি।

–সে তো অনেকেরই থাকতে পারে।

–তা পারে।

–তাহলে তো বোকা বনে যাব।

–আমার হাতে আপনার লেখা বই থাকবে।

–আমার লেখা বই?

হ্যাঁ।

-কোথায় পেলেন?

হ্যারি দিয়েছিল, তাহলে ঐ কথাই রইল।

মার্টিন কোন উত্তর না দিয়ে ফোন নামিয়ে চিন্তায় ডুবে যায়। মনে পড়ে কর্নেল তাকে বলেছিল হ্যারি দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছিল। সহসা তার মনে হল হ্যারির মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। যা পুলিশও বার করতে পারেনি।

.

০৪.

মার্টিন আমায় বলেছিল কার্টসকে প্রথম দেখে একটা ব্যাপার খারাপ লেগেছিল, সেটা পরচুলা। মাথায় ঠিকমতো লাগান ছিল না। অথচ চুলের রেখাগুলো দেখে মনে হয় একটা খেয়ালী মন ও মুগ্ধ করার মত রূপ তার আছে। যখন কথাগুলো শুনছিলাম সেই সময় একটি মেয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিল বরফের মধ্য দিয়ে। তাকে দেখে মার্টিনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে, খুশী করার জন্য বললাম বেশ সুন্দরী মেয়েটি না? চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে-সুন্দরী!

–আমার তো তাই মনে হয়।

মেয়েটার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলে–ওসব বাদ দিয়েছি মিঃ ক্যালাও। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন এর বিন্দুমাত্র প্রয়োজন হয় না।

আপনার কথা অস্বীকার করছিনা। তবেমনেহল মেয়েটিকে লক্ষ্য করছিলেন তাই বললাম।

ঠিক বলেছেন। কেন জানি না মেয়েটিকে দেখে একজনের কথা মনে পড়ছিল।

কার কথা?

আন্না স্মিড-এর।

–সে কে? সেও তো মেয়ে।

হ্যাঁ। একভাবে বলতে গেলে তাই হয়।

–একভাবে বলতে কি বোঝাচ্ছেন?

–সে ছিল হ্যারির প্রেমিক।

আপনি এখন ওর দেখাশুনা করবেন?

না মিঃ ক্যালাও। সে অন্য ধরণের মেয়ে, দেখেছেন তো হ্যারির কাজের সময়। তাছাড়া এখন ও সব ব্যাপারে থাকতে চাই না।

যাক। আপনি এতক্ষণ কার্টসের কথা বলছিলেন তার কথা বলুন।

–হ্যাঁ, আমি যখন হোটেলে গেলাম তখন দেখি কার্টস নির্জন আরোহী বইটা পড়ার ভান করছে। আমি সামনে যেতেই বলল রুদ্ধশ্বাস ভাবটা দারুণ টিকিয়ে রেখেছেন।

উত্তেজনা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

রহস্য ধরে রাখার এক নিপুণ কারিগর আপনি। বই শেষ না করে ওঠা যায় না।

ধন্যবাদ, এবার কাজের কথায় আসি। আপনি হ্যারি লাইমের বন্ধু ছিলেন না?

–শুধু বন্ধু?

–তাহলে?

–সব থেকে অন্তরঙ্গ, অবশ্য আপনাকে ছাড়া।

–তার মৃত্যু হল কিভাবে একটু বলুন।

কার্টিস একটু ভেবে বলল–দুর্ঘটনার সময় আমি হ্যারির সাথে ছিলাম। একসাথে আমরা ফ্ল্যাট থেকে বের হই। তারপর কুলার নামে এক আমেরিকান বন্ধুকে দেখতে পেয়ে ও তাকাল। রাস্তা পার হবার জন্য পা বাড়াতে হঠাৎ একটা জীপ মোড় ঘুরে এসে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিল।

তবে সত্যি বলতে গেলে ওরকম ভাবে রাস্তা পার হওয়া তার উচিত হয়নি।

–হ্যারির একজন প্রতিবেশী যে বলল ওর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে।

–তাহলে তো ভালই হত।

–কেন?

–অ্যাম্বুলেন্স ডাকা অবধি বেঁচে ছিল।

মার্টিন অবাক–তাহলে সে কথা বলেছিল।

–শেষ সময়ে আপনার সম্বন্ধে কিছু বলেছিল।

আমার সম্বন্ধে!

–হ্যাঁ।

–কি বলেছিল?

এ মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না, তবে অনুরোধ করেছিল আপনি এখানে এলে আপনার দেখাশুনা করার।(একটু থেমে) আমি আপনার ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করে রেখেছি।

মার্টিন একথার উত্তর না দিয়ে বলল–হ্যারি মারা যাবার সাথে সাথে আমায় আসতে বারণ করলেন না কেন?

–আমি তার করেছিলাম।

করেছিলেন?

–হ্যাঁ।

–কিন্তু আমি তো পাইনি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার হাতে গিয়ে পৌঁছয়নি।

–তাই হবে। আমারও কপাল, না হলে এ দৃশ্য আমায় দেখতে হয়!

ভিয়েনার এখন যা অবস্থা তার সেলার হতে পাঁচ ছদিন লেগে যায়।

–আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

–কি কথা?

–হ্যারির সম্বন্ধে।

–স্বচ্ছন্দে।

–আচ্ছা আপনি জানেন, হ্যারিকে পুলিশ সন্দেহকরত কোন বাজে ব্যাপারে জড়িত ছিল বলে।

সবাই জানে আমরা সিগারেট জাতীয় জিনিষ বিক্রি করে রোজগার করি।

তাহলে পুলিশ সন্দেহ করছে কেন?

–তা তো বলতে পারব না। মাঝে মাঝে পুলিশের মাথায় অদ্ভুত তত্ত্ব ফেরে।

আপনাকে একটা কথা বলি নিশ্চয়ই খুশী হবেন।

বলুন কি বলবেন। আমার ভাল লাগছে আপনার কথা শুনতে।

–আপনি আমার যাবার ব্যবস্থা করলেও এখন আমি যাব না।

ভ্রু কুঁচকে বলে কার্টস–যাবেন না?

না।

–কারণটা যদি দয়া করে বলেন।

–আমি, পুলিশের ধারণা যে মিথ্যে তা প্রমাণিত করে তবে যাব।

–তাতে লাভ? আমরা কি হ্যারিকে ফিরিয়ে আনতে পারব?

–তা পারব না ঠিকই…।

কার্টস মার্টিনকে থামিয়ে দিয়ে বলে–ওসব পুলিশী ঝামেলার মধ্যে নিজেকে জড়াবেন না দয়া করে।

জড়াতে আমি চাই না। আমি দেখতে চাই কর্নেলকে, যে হ্যারিকে দোষী বলছে। ওকে, ভিয়েনা ছাড়া করব আমি।

–আমি বুঝতে পারছি না কি করতে চাইছেন।

–হ্যারির মৃত্যুর রহস্য অনুসন্ধান করব।

অনুসন্ধান? আবার তো পুলিশী ঝামেলা।

এছাড়া কোন উপায় নেই।

–একথা কেন বলছেন?

–হ্যারি আমার প্রিয় বন্ধু, তাকে কেউ বদনাম করবে আমি সহ্য করব না।

–আমি আপনার রাগের কারণটা বুঝছি, তবু যদি...।

–উপায় নেই। আমাকে একটু সাহায্য করবেন?

–কি ব্যাপারে?

কুলারের ঠিকানাটা দেবেন?

নিশ্চয়ই।

–ওর, আর ড্রাইভারেরটাও।

ড্রাইভারের ঠিকানা তো জানি না।

–পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট থেকে জেনে নিতে পারব মনে হয়।

–আচ্ছা।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

–হ্যারির সেই প্রেমিকাকে কোথায় পাওয়া যাবে?

–হ্যারির প্রেমিকা?

–হ্যাঁ। তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

কিন্তু...

–কিন্তু কি?

–দেখা না করাই ভাল।

–এ কথা কেন বলছেন?

–হ্যারির ব্যাপারে কথা বললে মেয়েটি দুঃখ পাবে।

দুঃখ পাবে? কিছু করার নেই, আমার হ্যারির বিষয়ে জানা দরকার। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

নিশ্চয়ই।

–হ্যারিকে পুলিশ কি ব্যাপারে সন্দেহ করছে আপনি জানেন?

না, জানি না।

–অবশ্য অনেক কাজের বন্ধুও জানতে পারে না।

আমি একটা কথা ভাবছিলাম।

—কি কথা?

–আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে আপনি হ্যারির ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে কিছু নোংরা বেরিয়ে পড়ল।

–নোংরা?

–হ্যাঁ।

ঝুঁকি তো নিতেই হবে।

–আপনি খোঁজ করুন তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে একটা কথা ভেবে দেখেছেন?

–কি কথা?

–এতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টাকাও দরকার।

সময় যথেষ্ট আছে, আর টাকার ব্যাপারে আপনি সাহায্য করবেন না?

যদিও ধনীনই, তবু হ্যারিকে কথা দিয়েছিলাম আপনার থাকার ও শোওয়ার ব্যবস্থা করব।

–কিছু একটা ব্যাপারে বাজী ধরতে পারি আপনার সঙ্গে?

–কি ব্যাপারে? আমার স্থির বিশ্বাস হ্যারির মৃত্যুর পিছনে কোন রহস্য আছে।

রহস্য?

–হ্যাঁ।

রহস্য বলতে কি বোঝাতে চাইছেন?

–আমার ধারণা পুলিশের ব্যাপারে হ্যারির মৃতদেহ যতটা সুবিধা করেছিল, আসল ব্যাপারে যারা জড়িত তাদেরও কি ততটা সুবিধে হয়েছিল?

কথাটা শুনে কার্টস মুহূর্তের জন্য ভয় পেয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল– সাহায্যের দরকার হলে আমায় বলবেন।

–সে তো বলবই। এখন কুলারের ঠিকানাটা দিন।

কাগজে ঠিকানাটা লিখে দেয় কার্টস।

–আপনার ঠিকানাটা পেলে ভাল হত।

–আমার ঠিকানা?

–হ্যাঁ বিদেশে আছি তো, কখন কি দরকার লাগে তাই।

–ঠিক আছে।

ধন্যবাদ।

কার্টস উঠে পরচুলা ঠিক করে বলে–আমার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবেন না। এরপর লেখার প্রশংসা করে চলে যায়। কিন্তু মার্টিনের মনে হল হাসি কৃত্রিমতায় ভরা। সন্দেহের চোখে তার চলে যাওয়া দেখতে লাগল সে।

.

০৫.

যোশেফস্টাডের থিয়েটারে স্টেজের কাছে একটা চেয়ার নিয়ে মার্টিন বসে আছে আন্না স্মিডের অপেক্ষায়। একটা কার্ড পাঠিয়েছে হ্যারির বন্ধু লিখে।

হঠাৎ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে–মিঃ মার্টিন। তাকিয়ে দেখে উপরে পর্দার ফাঁকে আন্না স্মিড দাঁড়িয়ে। দেখতে খুব একটা সুন্দরী নয়। তবে আলগা শ্রী আছে। চুল কাল, বাদামী চোখ, চওড়া কপাল।

মেয়েটি বলে–আপনি কি ওপরে আসবেন?

নিশ্চয়ই।

–আমার ঘরটা ডানদিক থেকে দ্বিতীয়টা। একটা কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায় মার্টিন আমায় বলেছিল, এ জগতে কিছু লোক আছে যাদেরকে দেখে মনে হয় নিরীহ। আন্না স্মিড সেই দলের একজন।

মার্টিন আন্নার ঘরের সামনে এসে অনুমতি চায় প্রবেশের জন্য। আন্না মার্টিনকে স্বাগত জানায়। ঘরে ঢুকে মার্টিন লক্ষ্য করল অভিনেত্রীদের ঘরের মত ঘর নয়, পোশাক, প্রসাধন দ্রব্য কিছু নেই, শুধু এক জায়গায় কেটলীতে জল গরম হচ্ছে। আন্না মার্টিনকে প্রশ্ন করেচা খাবেন? চা খেতে ভাল না বাসলেও বলে, হ্যাঁ। মার্টিনকে চা দিয়ে, নিজে নিয়ে দুজনে মুখোমুখি চেয়ারে বসে। মার্টিন তাড়াতাড়ি চাটা খেয়ে নিয়ে কাপটা এগিয়ে রেখে বলে–আপনাকে কটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বলুন কি জানতে চান?

হ্যারির ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দরকার ছিল, তাই না এসে পারলাম না।

অবাক হয়ে আন্না বলে–হ্যারির ব্যাপারে?

–হ্যাঁ।

নিস্পৃহ ভাবে জিজ্ঞাসা করে–কি জিজ্ঞাস্য বলুন?

মার্টিন ভাবল নিজের সম্বন্ধে কিছু জানান ভাল, কেননা সে ছিল তারবন্ধু। তাই বলে আপনি হয়তো জানেন আমাদের পরিচয় দীর্ঘ কুড়ি বছরের। আমরা এক স্কুলে পড়তাম, পরবর্তীকালেও সম্পর্ক নষ্ট হয়নি।

–আপনার কার্ড দেখে আমি না করতে পারিনি, কিন্তু হ্যারির ব্যাপারে কিছু বলার নেই।

–কিন্তু আমি হ্যারির সম্বন্ধে...।

মার্টিনকে কথার সাথে সাথে আন্না বলে হ্যারি আজ মৃত।

–আমরা দুজনেই তো তাকে ভালবাসি।

বাসতাম।

না, এখনো ভালবাসি, আমার হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে ও।(একটু থেমে) আপনি কুলার বলে কাউকে চেনেন?

–সেই আমেরিকান ছেলেটা?

–হ্যাঁ।

–হ্যারি মারা যাওয়ার পর আমায় কিছু টাকা দিয়ে বলল এটা হ্যারি দিতে বলেছে।

–হ্যারি মারা যাবার সময়ও তোমার কথা চিন্তা করেছেতাতে মনে হয় খুব একটা যন্ত্রণা পায়নি।

–সে কথাটাই নিজেকে সব সময় বোঝাতে চাই, চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। তবু এক এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

–আচ্ছা হ্যারি মারা যাবার সময় আপনি কি ডাক্তারের কাছে গেছিলেন?

না, তখন যাবার মত মনের অবস্থা ছিল না। অন্যরা গেছিল।

–সেই ড্রাইভারটা কোর্টে কি বলেছিল, মনে আছে?

–হ্যাঁ, তবে...

তবে কি?

ড্রাইভারটা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

–কেন?

–ও হ্যারিকে চিনত।

–তারপর?

–শেষে কুলারের সাক্ষী ওকে বাঁচাল।

হঠাৎ জানালার বাইরে থেকে আমাকে কেউ ডাকতে ইতস্ততঃ বোধ করল, সে তারপর বলল–এখানে বেশীক্ষণ থাকার নিয়ম নেই। তাই...

মার্টিন তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করে পুলিশ কেন ওকে সন্দেহ করছে, আপনি জানেন?

না।

আমার মনে হয় মারাত্মক কিছুর সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়েছিল।

আপনার অনুমান হয়ত সত্যি।

–আচ্ছা কার্টস বলে কাউকে চেনেন?

–ঠিক মনে পড়ছে না।

যদি চিনতে পারেন, লোকটি পরচুলা পরে।

–ও, সেই লোকটার কথা জিজ্ঞাসা করছেন? আচ্ছা, ওরা সবাই মিলে হ্যারিকে খুন করেনি তো? আমার তো ডাক্তারটাকেও সন্দেহ হয়। আর ভেবে কি হবে সবই তো শেষ।

কিন্তু আমি কাউকে ছাড়ছি না।

কী করবেন?

–হ্যারির মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব।

আবার বাইরে থেকে মেয়েটিকে কেউ ডাকল। মার্টিনবলে–আমি চলি, আবার হয়ত আসতে হতে পারে।

–একটু দাঁড়ান। –

-কিছু বলবেন।

-হ্যাঁ।

বলুন।

–আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

–ও আচ্ছা। কুয়াশার মধ্য দিয়ে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। গুড়ো গুড়ো বরফ পড়ছে সমানে। মার্টিনের বেশ শীত করছে, মনে হল শরীরটাকে চাঙ্গা করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু, মনের যা অবস্থা তাতে কোন ক্লাবে যেতে ইচ্ছা করছে না। অগত্যা একটা সিগারেট ধরাল মার্টিন, আন্নাকেও দিলে আন্না নেয় না। মার্টিনের মাথায় নানা কথা ঘুরপাক খাচ্ছে। সবই বন্ধুকে ঘিরে, তবে একটা ব্যাপার তার আশ্চর্য লাগছে আন্নারকথা হ্যারি তাকে জানায়নি। জানালে তার সঙ্গে রসিকতা করতে পারত।পারত-

বিয়ে করেছ নিশ্চয়ই, কেমন দেখতে?সাংঘাতিক সুন্দরী!অভিনেত্রীযখন। আগে বলত–আলাপ না করিয়ে দাও একটা ফটো তো পাঠাও, দেখে চক্ষু সার্থক করি। তারপর উইক এন্ডে প্লেজার ট্রিপে কোথায় যাচ্ছ? আগে থেকে হনিমুনের জায়গা ঠিক আছে তো!

মার্টিন চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে একটা।

–মিঃ মার্টিন কিছু ভাবছেন?

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে লজ্জিত হয়ে পড়ে, বলে কিছু বলছিলেন?

বলছি, কি ভাবছেন?

–তেমন কিছু না।

আমার মন কিন্তু অন্য কথা বলছে।

–কি কথা?

বলব?

নিশ্চয়ই।

–আপনি কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন?

–আমি? আপনাকে লুকোব?

আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

–তাহলে সত্যি কথা বলি।

বলবেন বৈ কি?

–কিছু মনে করবেন না তে?

না,না, মনে করার কি আছে!তাছাড়া আপনি আমায় এমন কিছুঅসম্মতিজনক কথা বলবেন না নিশ্চয়ই? বিশেষ করে যখন হ্যারির বন্ধু ছিলেন।

–আসলে, আপনার সঙ্গে হ্যারির যে পরিচয় আছে সেটা আমায় আদৌ জানায় নি ও।

ও।

–অথচ সব কথা বলত ও, আমায় কিছু লুকোত না।

–জানান উচিত ছিল। তবে একটা কথা বলতে পারি।

–কি?

–আপনি যখন হ্যারির বন্ধু তখন আজ থেকে আমার বন্ধু।

মার্টিন খুশী হয়ে বলে-মিস্ স্মিড!

–হ্যাঁ মিঃ মার্টিন।

–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

নানা এতে ধন্যবাদের কি আছে। আর হ্যারির বন্ধু যখন নিশ্চয়ই ওর মত ভাল। তাই এত কথা আপনাকে বললাম। আসলে...।

–থামলেন কেন? বলুন।

–আসলে বড্ড একা হয়ে পড়েছি। নিঃসঙ্গতা কাটাতে আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। ঘরের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসছে। একা থাকলে হ্যারি যেন সামনে এসে দাঁড়ায়, ওর নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় আমার পাগলের মত অবস্থা হয়। সহ্য করতে পারি না। মনে হয় সত্যিই পাগল হয়ে যাব।

-না, না ও কথা বলবেন না।

বলতে তো চাই না। কিন্তু, না বলেও থাকতে পারছি না। ওকে বোঝা যায় না।

আন্না যদি এ মুহূর্তে কাঁদতে পারত তাহলে হাল্কা হত। কাঁদতে পারছে না বলে আরও গুমরে রয়েছে, মার্টিন ভাবে।

–আসলে ও ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। সিগারেটটা বিস্বাদ লাগছে এবার মার্টিনের, ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দুজনে বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত মনে পাশাপাশি চলতে থাকে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মার্টিন বলে–একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম।

–কি কথা? আন্না যেন স্বস্তি পেল। এতক্ষণ চুপ করে থেকে ভিতরে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল।

না, জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না। হয়তো আপনি...।

–আমি কি?

দুঃখ পাবেন।

করুন হাসি হেসে বলল-দুঃখ?

-হ্যাঁ।

নতুন করে কি দুঃখ দেবেন। যা পাবার তো পেয়েছি, এখন কোন কিছুতেই কিছু হয় না, সহ্য হয়ে গেছে। বলুন, কি বলবেন?

ইতস্ততঃ করে বলে মার্টিন–আপনি কি হ্যারিকে আগে থাকতেই চিনতেন?

আন্না যদি চেনে তাহলে হ্যারির সম্বন্ধে অনেক খবর হয়ত পাওয়া যাবে, যা তার কাছে অজানা।

অনেক কষ্টে যেন উত্তর দেয়–না।

–প্রথম পরিচয় কিভাবে হল?

আন্না চলা থামিয়ে বলে, আমাদের প্রথম পরিচয়?

মেয়েটিকে ও ভাবে দাঁড়াতে দেখে মার্টিন কুণ্ঠিত হয়, মনে ভাবে না জিজ্ঞাসা করলেই ভাল হত। যদি না জানতে চাইতে এখন, কি ক্ষতি হত। নিজের ওপর নিজেরই রাগ হয় তার। সঙ্গে সঙ্গে বলে–যদি কোন আপত্তি না থাকে। কথাটা যেন জোলো হয়ে গেছে এই ভেবে আবার বলল–আমার কৌতূহল আপনার দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

-না না, আপনি এত সংকোচ করবেন না, আমি ওর ব্যাপারে সবকিছু আপনাকে বলতে চাই। আর...আবার বলতে শুরু করে আন্না।

–আর কি?

–আপনার মধ্যে দিয়ে ওকে নতুন করে জানছি।

হঠাৎ এ কথা বলছেন কেন?

কথাটা মনে হল, তাই বললাম। আপনার ভয়ের কিছু নেই।

–আমি ভয় পাইনি। মানে আপনার কথাগুলো ঠিক...।

বুঝতে পারছেন না, তাইতো?

–হ্যাঁ।

–আসলে আপনি তো ওর বন্ধু, ওর ব্যাপারে অনেক কথা জানতে পারব।

–অবশ্যই পারবেন।

–যে কথা হচ্ছিল, হ্যারির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ঐ যোশেফস্টাড থিয়েটারে।

থিয়েটারে?

–হ্যাঁ।

–কিন্তু...

–কিন্তু কি?

–ওর সিনেমা থিয়েটারের প্রতি অনুরাগ ছিল, তা তো জানতাম না।

–ছিল কিনা বলতে পারব না।

–তারপর?

–সেদিন বোধহয় ছুটির দিন ছিল। তারিখটা মনে আসছে না, ডায়রী দেখলে জানা যাবে। আমার ঘরে আছে।

ডায়রীতে সব কিছু লেখেন বোধহয়?

–সব কিছু নয়।

–তবে?

–মানে স্মরণীয় কিছু ঘটনা আর কি!

–সেদিন ওর আসাটা আপনার কাছে সেরকম কিছু মনে হয়েছিল।

এখন নাও হতে পারে।

এরপর?

–হা মনে পড়েছে, গুড ফ্রাইডে ছিল সেদিন।

সবে অভিনয় শেষ হয়েছে। খুব ক্লান্ত লাগাতে পোশাক না ছেড়েই শুয়ে পড়েছিলাম। ঘরে অল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছিল, দরজা ভেজান। থিয়েটারের একটা কাজের ছেলে এসে বলল-মিস স্মিড, ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি?

আমি চোখ না খুলেই সাড়া দিলাম।

–আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন একজন।

–আমার সঙ্গে?

–হ্যাঁ। উপরে নিয়ে আসব?

এর আগে কোনদিন এসেছিল?

না।

নাম জিজ্ঞাসা করেছ? চিন্তিত হয়ে পড়ে আন্না।

করেছি।

–কি নাম?

–হ্যারি লাইম।

–ও নামে কাউকে আমি চিনি না। অন্য কাউকে ডাকছে দেখ। শুনতে ভুল হয়েছে তোমার।

–কিন্তু নিজের কানে শুনেছি।

–ভুল হয়েছে বলছি তো।

–ভুল।

–হ্যাঁ। আন্না যেমন ছিল সেরকমই থাকে।

–আমি গিয়ে আর একবার জিজ্ঞাসা করব?

যাও।

একটু পরে ছেলেটি ফিরে এসে বলল হ্যাঁ, আপনাকেই ডাকছেন।

–ঠিক আছে নিয়ে এস।

অগত্যা বিছানা ছেড়ে উঠতেই হল। একটু পরে হ্যারি এল। কাজের ছেলেটি চলে যেতে ফুলের তোড়া আমার হাতে দিয়ে হেসে বলল–আজকের অভিনয়ের জন্য ধন্যবাদ।

আনন্দের সঙ্গে ফুলগুলো নিয়ে হ্যারিকে ধন্যবাদ জানাই। খেয়াল হয় ওকে বসতে বলি নি। সোফায় বসতে বলি।

আপনাকে বিরক্ত করছি না তো?

না না। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? –হ্যাঁ বলুন।

একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছা করছে।

–কোন কথা?

–আমার অভিনয় ভাল লেগেছে?

হেসে মাথা নাড়ে হ্যারি।

-ধন্যবাদ!

–আপনি ক্লান্ত জেনেও আলাপ করতে এলাম।

–কিন্তু আমাকে তো সবাই অভিনেত্রী হিসাবে কদর করে না।

–ওটা বাড়াবাড়ি। ভাল অভিনয় করতে না পারলে থিয়েটার গোষ্ঠী কি আপনাকে পুষত?

–একটু কফির ব্যবস্থা করি। কেননা এখন মদ দিতে পারব না।

–ওসব কিছু চাই না। আপনি কথা বলুন তাতেই হবে।

–আমি বড় দরের অভিনেত্রী তো নই, সেজন্য অন্তত একটু কফি হোক।

–অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমার এখন একটু পানীয় দরকার।

হ্যারি কফি শেষ করে অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য ডায়রী এগিয়ে দেয় আন্নার দিকে। তাকে উঁচু আসনে বসাতে কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে আন্না, তারপর ক্রমশঃ দুজনে দুজনার কাছাকাছি এসেছে। আনন্দের মাঝে হারিয়ে গেছে।

নিঃশব্দে মার্টিন ও আন্না হেঁটে চলেছে। তার নিজের ঘটনা বলা শেষ। হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম স্টপেজে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। আন্না বলে-এবার ট্রামে উঠতে হবে।

যাবেন বই কি।

আবার দেখা হলে খুশী হব।

–আমিও।

কিছুটা ইতস্ততঃ করে আবার বলে একটা কথা বলার ছিল আপনাকে।

-হ্যাঁ বলুন। এত সঙ্কোচের কি আছে।

না ঠিক সঙ্কোচ নয়। তবে যদি অভয় দেন তো বলি।

–মানে অনুমতি?

–হ্যাঁ।

কথাটা খুব সাধারণ বলে মনে হচ্ছে না।

না তেমন কিছু নয়।

–তাহলে অনুমতি চাইছেন কেন?

–মানে আপনাকে বলতে ঠিক ভরসা পাচ্ছি না।

–তা কথাটা কি?

–মানে আমি বলছিলাম...

বলুন কি বলবেন। এত ইতস্ততঃ করার কিছু নেই। আর আমি তো আগেই বলেছি, আপনি হ্যারির বন্ধু, কখনো খারাপ ব্যবহার করতে পারেন না আমার সাথে।

-সে তো ঠিকই।

–তাহলে এত দ্বিধা কেন?

আমি বলছিলাম, আপনার ডায়রীতে আজকের কথাগুলো লিখে রাখবেন? না।

–লিখবেন না?

না।

কারণটা যদি বলেন?

–হ্যারি মারা যাবার পর থেকে আর লিখি না। এখন আমার লেখার কি আছে? নিজের জীবন নিজের কাছেই মিথ্যা মনে হচ্ছে।

না-না, একথা বলছেন কেন?

বলতে তো চাই না, কিন্তু চলে আসে। যত রাত বাড়তে থাকে তত হ্যারি যেন সামনে এসে দাঁড়ায়, কথা বলতে চায়। আমি শুধু বোবা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকি। কিছু বলতে পারি না। সে কী যন্ত্রণা, বলে বোঝান যাবে না। আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছি।

কিন্তু আপনার সামনে সমস্ত জীবন পড়ে আছে। এভাবে ভেঙে পড়লে বাঁচকেন কি করে!

–সে কথা ভাবতে পারছি না।

না ভাবলে তো চলবে না।

আমি সব কিছু ভুলে যেতে চাই।

–মানুষ তো তা পারে না। তার চাহিদা অনেক।

চাহিদা?

–হ্যাঁ।

করুণ মুখ করে বলে আন্না–এখন আর চাহিদা বলে কিছু নেই, সব ফুরিয়ে গেছে।

এখন মন উতলা, তাই এরকম মনে হচ্ছে। একদিন দেখবেন...।

মার্টিনকে থামিয়ে দেয় আমা, আর এসব আলোচনা তার ভাল লাগছে না। মনে হল মার্টিন তার কথায় কিছু মনে করতে পারে। কিন্তু কি করবে? তার মনের কথা সেই জানে।

ট্রাম এসে পড়তে বিদায় নিয়ে চলে যায় আন্না।

২. পেশাদারী গোয়েন্দা

০৬.

পেশাদারী গোয়েন্দার থেকে শখের গোয়েন্দাদের সুবিধা অনেক বেশী। কাজের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম থাকে না। সত্যি বলতে কি, মার্টিন একদিনে যা করেছিল, আমার লোক হলে সেই কাজ করতে দুদিন লাগত। সবচেয়ে বড় সুবিধে সে হ্যারির বন্ধু তাই সরাসরি ভিতরে যেতে পারছিল। আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

মার্টিন এবার ডাঃ উইস্কলোরের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে। হ্যারি লাইমের বন্ধু বলে কার্ড পাঠিয়ে ডাক্তারের বৈঠকখানায় বসে আছে। ঘরে পুরনো দিনের জিনিষে ভর্তি। দেওয়ালে অনেকগুলো ক্রশ ঝোলান, মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর কাঠের ও আইভরির পুরনো মূর্তিগুলো চারদিকে ছড়ান। বড় বড় উঁচু চেয়ারও রয়েছে। ..

ডাঃ উইস্কলোরের ছোটখাট চেহারা, পোশাক চটকদার, গায়ে কালো কোট উঁচু কলার, ঘোট গোঁফ। মার্টিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল–আপনি মিঃ মার্টিন? হ্যারির বন্ধু?

হ্যাঁ। তা আপনার সংগ্রহশালাটা তো ভারী চমৎকার।

আপনার আসার কারণ, অমি রুগী বসিয়ে এসেছিলো।

মার্টিন লজ্জা পেয়ে বলে বক্তব্য সংক্ষেপেই পেশ করব। আমরা দুজনেই তো হ্যারির বন্ধু ছিলাম, তাই না।

–আমরা বলতে কি আমাকেও বোঝাচ্ছেন?

–হ্যাঁ।

বাদ দিতে পারেন।

–কেন?

–আমি তার চিকিৎসক ছিলাম মাত্র।

–যাক্, হ্যারি আমায় এখানে ডেকেছিল তাকে কি একটা ব্যাপারে সাহায্য করতে। কিন্তু, এসে দেখি সব শেষ।

-সত্যি ব্যাপারটা বড় দুঃখের।

–আমি সমস্ত ঘটনাটা জানতে চাইছি।

–আপনাকে জানাবার মত কিছু নেই।

–কিছুই নেই?

না।

—অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে।

–আমি যেটুকু জানি বলছি। গাড়ি চাপা দেওয়ার পর গিয়ে দেখি হ্যারি মৃত।

–আচ্ছা, ঐ ঘটনার পর কি জ্ঞান থাকা সম্ভব?

–কিছু সময়ের জন্য থাকলেও থাকতে পারে।

–আপনি কি নিশ্চিত, এটা নিছক দুর্ঘটনা?

দেওয়াল থেকে একটা ক্রশ তুলে নিয়ে ডাক্তার বলে–আমি সেখানে ছিলাম না। আর আমার কাজ মৃত্যু কি কারণে ঘটেছিল তার ওপর সীমাবদ্ধ। এতে অসন্তোষের কি কোন কারণ আছে?

পুলিশ হ্যারিকে বাজে ব্যাপারে জড়িয়েছিল। আমার মনে হয় এটা খুন নয়ত আত্মহত্যা।

এ ব্যাপারে কোন মতামত নেই।

–আপনি কুলার বলে কাউকে চেনেন?

না ঠিক মনে করতে পারছি না।

–হ্যারির মৃত্যুর সময় সে কিন্তু ওখানে ছিল।

–তাহলে নিশ্চয়ই দেখেছি। আচ্ছা মাথায় কি পরচুলা আছে?

না, আপনি কার্টসের সঙ্গে ভুল করছেন।

–সেখানে কিন্তু আরও একজন ছিল।

–আপনি কি অনেকদিন হ্যারির চিকিৎসা করছিলেন?

হ্যাঁ।

কতদিন হবে?

–তা প্রায় বছর খানেক।

আর আপনার সময় নষ্ট করব না। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালই লাগছে, তাহলে চলি।

.

০৭.

অনুসন্ধান পর্বের এত বিবৃতির মধ্যে মার্টিন, কোন সন্দেহজনক কিছু পায়নি। ডাক্তারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হঠাৎ কি খেয়াল হল হ্যারির ফ্ল্যাটে গেল। সেই প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলা খুবই দরকার।

এক সময় হ্যারির পাশের ফ্ল্যাটে হাজির হয় সে। বেল টিপতে লোকটি বেরিয়ে আসে, মার্টিনকে দেখে চিনতে পারে। ইতিমধ্যে লোকটির স্ত্রীও এসেছে। তাকে বলল–এ পুলিশের লোক নয়, বিশ্বাস কর, হ্যারির বন্ধু, কদিন আগে এসেছিল।

ভদ্রমহিলা কোন জবাব দিল না, মনে হয় অবিশ্বাস করল, একবার স্বামীর দিকে একবার মার্টিনের দিকে তাকিয়ে চলে গেল। লোকটি এবার বলল–আমি সেদিন দুর্ঘটনাটা দেখেছি।

–আপনি কি করে বুঝলেন ওটা দুর্ঘটনা ছিল?

একটা কারণ আছে।

–সেটাই তো জানতে চাই।

মার্টিনকে ফ্ল্যাটের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে সিগারেট দিয়ে লোকটি আবার শুরু করল।

হঠাৎ গাড়ির ব্রেক কষার শব্দ হতে জানালার কাছে গিয়ে দেখি, হ্যারিকে ধরাধরি করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে আসছে।

আপনি কি এ ব্যাপারে সাক্ষী দিয়েছেন?

না।

–কেন?

–পুলিশে জড়াতে চাই না। তাছাড়া....।

–কি?

–আমি তো সবটা জানি না।

–আচ্ছা দুর্ঘটনার পর কি মনে হচ্ছিল ও খুব কষ্ট পাচ্ছে?

না তো।

–এ কথা কেন বলছেন।

কারণ ও সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে।

–আপনি কি ডাক্তার?

না।

–তাহলে কি করে বুঝলেন?

–আমি লাশ ঘরের হেড ক্লার্ক। তাই জানালা দিয়ে তাকিয়েই বুঝেছি, ও বেঁচে নেই।

-কিন্তু অনেকে বলেছে যে হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়নি।

মৃত্যুকে আমার মত কেউ চেনে না। আমার নাম হেরচক। আমার অভিজ্ঞতার কথা আশেপাশের লোকেদের জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন।

না না, আমি অস্বীকার করছি না। তবে খবর পেয়েছি হ্যারি ডাক্তার আসার আগেই মারা গেছে।

জোর দিয়ে বলে হেরচক–না। সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে।

–তবে মিঃ হেরচক আপনার কোর্টে সাক্ষী দেওয়া উচিত ছিল।

–কিন্তু মিঃ মার্টিন পুলিশের ব্যাপারে সকলের সাবধান হওয়া উচিত। ইচ্ছাকৃতভাবে কে পুলিশের কাছে যায়, তাছাড়া আমি তো প্রত্যক্ষদর্শী নই।

আর কে কে ছিল?

–তিনজনকে দেখেছি হ্যারির দেহ বয়ে আনতে।

–হ্যাঁ জানি। তাদের মধ্যে ড্রাইভার ছিল।

–না। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নামেনি, গাড়িতেই বসেছিল।

কথাটা শুনে মার্টিন চমকে ওঠে, বলে–সেই লোকগুলোর একটু বর্ণনা দিতে পারেন?

হেরচক জানায়, এই ঘটনার সঙ্গে যাতে না জড়িয়ে পড়ে তাই জানালা পরে বন্ধ করে দিয়েছিল। এবং সে সাক্ষী দিতে রাজী নয়।

মার্টিন চিন্তিত হয়ে পড়ে। এটা যে একটা খুন সে বিষয়ে নিশ্চিত, অথচ এরা কেউই হ্যারির মৃত্যুর সঠিক সময় জানাতে পারল না। এখন পর্যন্ত যে দুজন বন্ধুর সন্ধান পাওয়া গেছে যারা টাকা ও দেশে ফেরার টিকিট দিতে চেয়েছে। তাহলে তৃতীয় ব্যক্তিটি কে?

বেশ কিছুক্ষণ পর আবার হেচককে জিজ্ঞাসা করে আপনি কি হ্যারিকে ফ্ল্যাট থেকে বের হতে দেখেছেন?

না।

–কোন রকম চিৎকার চেঁচামেচি।

না, শুধু ব্রেক কষার শব্দ।

মার্টিন মনে মনে সিদ্ধান্তে এল: কার্টস,কুলার ও ড্রাইভার ছাড়া জানা যাবেনা হ্যারি খুন হয়েছিল কি না।

–হ্যারির ফ্ল্যাটের চাবি কার কাছে থাকে?

–আমার কাছে।

–একবার ফ্ল্যাটটা দেখতে পারি?

–নিশ্চয়ই।

এরপর স্ত্রীকে ডেকে চাবিটা আনতে বলে। বোঝা যায় ভদ্রমহিলা খুশী নয়। হ্যারির ফ্ল্যাটটা খোলা হলে দেখা যায় বৈঠকখানা ঘরটা ছোট, ঘরে টার্কিস সিগারেটের গন্ধ যেন এখনও ভাসছে। শোবার ঘরে নিভাজ বিছানা। সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখে যেন মনে হয় হ্যারি যেন কদিন। আগেও এখানে ছিল।

মার্টিন বলে উঠল–হ্যারির রুচি বোধ আছে। পরিষ্কারও বটে।

–কি ভেবে বললেন?

ফ্ল্যাটটা এত পরিষ্কার তাই।

ইলকে সমস্ত কিছু করেছে। আসলে হ্যারি তো গোছাল নয়।

ঘরে কি তেমন কোন কাগজপত্র ছিল?

–এক বন্ধু এসে ওর ব্রিফকেস আর কাগজ ফেলার ঝুড়িটা নিয়ে গেছে।

বন্ধু নিয়ে গেছে?

–হ্যাঁ।

–কে সে বন্ধু?

–ঐ যে পরচুলা পরা লোকটা।

–ঠিক মনে আছে তো?

–হ্যাঁ। ।

এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমি, হ্যারিকে খুন করা হয়েছে।

–খুন?

–হ্যাঁ।

হঠাৎ হেরচক বলে–এসব অর্থহীন কথা বলবেন জানলে, এখানে আপনাকে আনতাম না।

আপনি আমায় অপমান করুন আর যাই করুন, আপনার সাক্ষী কাজে লাগত।

—আমার আর কিছু বলার নেই।

–নেই?

–না, আমি কিছুই দেখিনি। আপনি এবার আসুন।

বলেই সোজা দরজার দিকে এগিয়ে গেল হেরচক। মার্টিনকে চলে যাবার আগে বলে–এসব ব্যাপারে আমায় কিন্তু কিছুতেই জড়াবেন না।

পরে দেখা যাবে।

–ও কাজ করবেন না।

দয়া করে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন।

আমার যা বোঝার তা বুঝে গেছি।

–বোঝেননি, তাহলে এত করে বলতাম না।

–আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

—মিঃ হেরচক!

বললাম তো।

–আপনি চান না সত্য প্রকাশ হোক।

–অসত্য কিছু থাকলে তো প্রকাশ হবে। আপনাকে তো আগেই বলেছি ওটা নিছক দুর্ঘটনা তবু জেদ করছেন। তাই আর আমার আগ্রহ নেই।

–আমার আছে।

–তাতে আমি বাধা দিচ্ছি না।

–মুখে বলছেন কিন্তু সাহায্য করতে চাইছেন না।

আমি এবার বের হব।

–অর্থাৎ, আমায় যেতে বলছেন?

—হ্যাঁ।

ঠিক আছে চলি, আবার দেখা হবে।

না দেখা হলেই খুশী হব।

–কিন্তু সেটা যে আমার অখুশীর কারণ হবে।

চলি।

মার্টিন হোটেলে ফিরতে একজন কর্মচারী একটা চিঠি দিল। মার্টিন ঘুরে তাকায় চিঠি?

–হ্যাঁ।

–কে দিয়ে গেছে?

–দেখিনি।

–তবে কোথায় পেলেন?

–লেটার বক্সে পড়েছিল।

চিঠি খুলে দেখে ক্রাবিনের লেখা। তাতে আছে পরবর্তী অনুষ্ঠানসূচী নিয়ে আলোচনা হবে আর মার্টিনের সম্মানে আগামী সপ্তাহে একটা ককটেল পার্টির আয়োজন হচ্ছে। এবং আজকের অনুষ্ঠানে সে নিশ্চয়ই হাজির থাকবে। তাই ঠিক আটটা পনেরোতে গাড়ি আসবে হোটেলে মার্টিনকে নিয়ে যেতে।

চিঠিটা পড়ে এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ না দেখিয়ে বিশ্রাম নিতে গেল মার্টিন।

.

০৮.

কুলারের সাথে দেখা করবে বলে তার ফ্ল্যাটে মার্টিন পৌঁছাল পাঁচটার সময়। এই এলাকাটা আমেরিকার অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। ফ্ল্যাটের নিচেই একটা আইসক্রীমের দোকান। লোকও আছে। কুলারের ফ্লাটে গিয়ে বেল বাজাল মার্টিন। কুলার দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে–হ্যারির যখন বন্ধু তখন আমার বন্ধু। তাছাড়া আপনাকে আমি চিনি।

মার্টিন অবাক, বলে–আমায় চেনেন?

-হ্যাঁ।

–হ্যারির কাছে শুনেছেন বোধহয়?

না।

–তাহলে?

–আমি পশ্চিমী নভেলের খুব ভক্ত। বুঝতেই পারছেন।

অন্য সময় হলে খুশী হত মার্টিন কিন্তু এখন তেমন খুশী হল না। সবকিছু কেমন বাজে লাগছে। আসলে হ্যারির মৃত্যুকে সেঠিক মানতে পারছেনা। তবুও বলল–আপনি আমারনভেল পড়েছেন শুনে সুখী হলাম।

-না, না ওকথা বলবেন না।

–সত্যি কথা বললে তাই দাঁড়ায়।

–আমাকে একজন সমঝদার পাঠক ভাববেন না।

–আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

বলুন।

–হ্যারির মৃত্যুর সময় আপনি তো ওখানে ছিলেন?

-ও সে কি মর্মান্তিক দৃশ্য! আর ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস দেখুন সে সময় আমি হ্যারির : কাছেই যাচ্ছিলাম।

–কি করে ঘটল ঘটনাটা।

–হ্যারি আমাকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হতে যায়, তখনই একটা গাড়ি ছুটে এসে ধাক্কা মারে।

–গাড়ির ড্রাইভার ব্রেক কষেনি?

কষেছিল, কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ।

এবার একটু পানীয় নেওয়া যাক। হ্যারির এই সব কথা ভাবলে এর আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

–দিতে পারেন। আচ্ছা মিঃ কুলার ড্রাইভার ছাড়া গাড়িতে আর কেউ ছিল?

গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়েও থেমে যায় সে। মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলে–কোন লোকটার কথা বলছেন?

–আমি শুনেছি আর কেউ ছিল।

–আমি জানি না।

জানেন না?

না। এসব কোত্থেকে শুনেছেন।

একটু থেমে আবার বলে ইচ্ছা করলে পুলিশ রিপোর্ট থেকে জেনে নিন।

তা অবশ্য জানা যায়, তবু আপনার কাছ থেকেই শুনতে চাইছিলাম।

–তখন আমি,কার্টসও ড্রাইভার ছাড়া কেউ ছিলনা। আপনি সম্ভবত ডাক্তারের কথা বলছেন?

–আমি হ্যারির পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, ড্রাইভার ছাড়া আরও তিনজন লোক ছিল, এবং.

মার্টিন ইচ্ছে করে মাঝপথে থেমে যায়। তাকে রহস্যটা খুঁজে বের করতেই হবে।

এবং কি?

তার মধ্যে ডাক্তার ছিল না। লোকটি জানালা দিয়ে সব দেখেছে।

–জানালা দিয়ে দেখেছে?

–হ্যাঁ। স্থির দৃষ্টিতে সে কুলারকে দেখতে থাকে।

-দেখতে ভুলও হতে পারে।

হতে পারে না, তা বলছি না। তবে...।

–কী? একটু ব্যস্ত মনে হয় কুলারকে।

হয়ত দেখতে তার ভুল হয়নি।

এবার আমার একটা কথার জবাব দেবেন?

–কি?

–সে কি কোর্টে সাক্ষী দিয়েছিল?

না।

-কেন?

–পুলিশে নিজেকে জড়াতে চায়নি তাই।

–ভালকরে দেখলে তো সাক্ষী দেবে।আপনি গেছেন,যাহোকমনগড়া কিছু একটা বলে দিয়েছে।

মনগড়া?

–হ্যাঁ। আপনি এসব ইওরোপীয়ানগুলোকে কোনদিন সুনাগরিক করে তুলতে পারবেন না।

–এ কথা কেন বলছেন?

ওর কোর্টে সাক্ষী দেওয়া উচিত ছিল।

–হ্যাঁ এ ব্যাপারে আমিও একমত।

দুর্ঘটনার পর রিপোর্ট নানাভাবে হতে পারে। তবে সবগুলোই প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। মার্টিনের দিকে একটু ঝুঁকে বলে–ও আর কি দেখেছে! গলার স্বরে অস্বাভাবিকতা।

না আর কিছু দেখেনি, তবে হ্যারিকে যখন বাড়ির দিকে নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন সে যে বেঁচে নেই একথা বলেছে।

হয়ত প্রসঙ্গ বদলারার জন্যই, কুলার বলল–প্রায় চেনাই বলেছে।

মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলল–আর একটু মদ দেব আপনাকে?

না আর দরকার নেই।

জানেন হ্যারিকে খুব ভালবাসতাম। ওর প্রসঙ্গ উঠলেই খুব কষ্ট হয়। তাই দয়া করে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

–আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করেই চলে যাব।

–কি কথা।

আন্না স্মিডকে চেনেন?

–হ্যারির প্রেমিকা?

–হ্যাঁ।

–একবারের জন্য দেখেছিলাম। ওর কাগজপত্র আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম।

বন্ধুর প্রেমিকার জন্য উচিত কর্তব্যই করেছেন। তবে কারণটা যদি বলেন।

–আসলে আন্না ছিল হাঙ্গেরিয়ান, বাবা জার্মানি। সব সময় রাশিয়ানদের ভয় পেত। এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠে। সরি বলে কুলার উঠে গিয়ে ফোনে কিছু কথা বলে ফিরে আসে। মার্টিন প্রশ্ন করে–পুলিশ হ্যারির ব্যাপারে যে কথা বলেছে সে সম্বন্ধে কিছু জানেন?

আমার মনে হয় না সে রকম কিছু থাকতে পারে। নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে ও খুব সজাগ ছিল।

–কিন্তু পুলিশ বলেছে ও এ ব্যাপারে জড়িত ছিল।

–কোন মন্তব্য অবান্তর।

মার্টিন আর কোন কথা না বলে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসে। সবাই এত সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছে যে দিশেহারা অবস্থা, আবার দুর্ঘটনার সময় সে ছিল না। এরা সাহায্য না করলে খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার অবস্থা হবে। না, যে করেই হোক হত্যাকারীকে খুঁজে পেতেই হবে।

.

০৯.

মার্টিন নদীর ধার দিয়ে হেঁটে চলেছে। রাত বেশ হয়েছে। অন্ধকারে বাড়িগুলোকে দৈত্যের মত লাগছে। কিছুটা দূরে একটা মিলিটারী থানার কাছে চারজন মিলিটারী একটা জীপে উঠছে।

কুলারের কাছে মদ খাওয়ার পর তার নারী সঙ্গের দরকার হয়ে পড়েছে। মনে পড়ছে বিগত সময়ের আমস্টারডাম ও প্যারিসের নারীসঙ্গের কথা। মার্টিন নিজেকে সংযত করে

আমার বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। রাস্তায় বিজ্ঞাপনে দেখেছে আজ যোসেফস্টাডে কোন নাটক নেই। তার মানে। বেরিয়ে না গেলে আন্নাকে পাওয়া যাবে।

তার ফ্ল্যাটে গিয়ে বেল বাজায় মার্টিন। এখনো মদের নেশা কাটেনি মাথা ঝিমঝিম করছে। আন্না দরজা খুলতে মার্টিন মিথ্যে কথা বলে–আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনার ফ্ল্যাটের দরজা খোলা দেখে চলে এলাম।

–কোথায় যাচ্ছিলেন? এতো শহরের শেষ প্রান্ত।

একটুও বিচলিত না হয়ে বলেকুলারের বাড়িতে একটু বেশী ড্রিঙ্ক করে ফেলেছি তাই রাস্তায় ঘুরছিলাম।

মার্টিনকে ঘরে বসিয়ে আন্না জানায় চা ছাড়া এখন আর অন্য পানীয় সে খাওয়াতে পারবে না।

মার্টিন বলে–না,না আপনি বিব্রত হবেননা। টেবিলে রাখা একটা বই দেখেকুণ্ঠার সঙ্গে আবার বলল-হঠাৎ এসে বিরক্ত করলাম না তো?

-না, না।

–আমি এখানে কিছুক্ষণের জন্য বসতে পারি?

–হ্যাঁ নিশ্চয়ই। একটু চুপকরে আবার বলে আপনার বেল বাজান শুনে আজ বারবার হ্যারির কথা মনে পড়ছে, এমনি করেই সে আমার কাছে আসত।

আন্না মনে মনে হ্যারির উপস্থিতি টের পাচ্ছে, তাই কখন মার্টিনের দিকে এগিয়ে গেছে নিজেই জানে না। মার্টিনও ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে বলে জানলার পর্দা ফেলতে গেছিল, সে টের পায় মেয়েটির হাত তার হাতের মধ্যে। মার্টিন হেসে বলে–এ সময় হ্যারি কি করত?

সহসা গম্ভীর হয়ে বলে আন্না–পুরনো গান নিয়ে সে থাকত।ওগুলোই ওকে প্রেরণা জোগাত।

মার্টিন ভাবে কি করে তাকে খুশী করা যায়। পুরনো একটা গান, হ্যারির খুব প্রিয়। সেটা মনে পড়তেই শিস দিয়ে গাইতে থাকে।

আন্না যেন শ্বাস বন্ধ করে মার্টিনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মার্টিন বলে–হ্যারির কথা ভেবে আর কি করব! মায়া কাটিয়ে চিরদিনের মত চলে গেল। এলাম ওর সঙ্গে দেখা করতে, এসে শুনতে হল–হ্যারি নেই।

–তা আমি জানি, কিন্তু আমিও তো মানুষ। আমার একটা অবলম্বন দরকার।

–তুমিও একদিন সবকিছু ভুলে যাবে।

ভুলে যাব?

–হ্যাঁ।

–একথা বলতে পারলে?

–এটাই তো নিয়ম। তার ব্যতিক্রম হবে কি করে?

ব্যতিক্রম হতেই হবে আমায় হ্যারির জন্য।

–হলে ভাল। কিন্তু...

–কিন্তু কি?

একদিন সব ভুলে গিয়ে আবার প্রেমে পড়বে। আয়া চেঁচিয়ে বলে–প্রেমে পড়ব? আমি? তোমার কথা কিছুতেই মানতে পারছি না। আমি এসব চাই না।

মার্টিন সরে আসে জানলার কাছ থেকে। ডিভানে এসে বসে। অন্যসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে গত দুদিনের কথা শোনায় আন্নাকে। সব শোনার পর আন্না বলে কার্টস, কুলার দুজনেই মিথ্যে কথা বলেছে।

–সম্ভবতঃ এরা তৃতীয় বন্ধুর অসুবিধে মেটাতে চাইছেনা।তবে সে ধরা পড়লে এরাও রেহাই পাবে না। আর আমায় তো তাড়াতে পারলে বাঁচে। এখন আমি কি করব? যাব আর একবার হেরচকের কাছে।

–তাই চলো।

–তুমিও যাবে?

–হ্যাঁ। আমার মনে হয় হেরচক ও তার স্ত্রী আমায় সরাসরি না বলবে না।

ঠাণ্ডা হাওয়া আর গুঁড়ি গুঁড়ি বরফের মধ্যে দিয়ে তারা রওনা হয় হেরচকের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

আন্না জিজ্ঞাসা করে হেরচকের ফ্ল্যাটটা কি খুব দূরে?

-না খুব বেশী দূরে নয়।

অপর পারে তাকিয়ে দেখে কিছু লোক। কিছুটা এগিয়ে দেখে মার্টিন চিৎকার করে বলে– আরে! হেরচকের বাড়ির তলায় তোক কেন?

–ও এটাই হেরচকের বাড়ি?

–হ্যাঁ। কিন্তু লোক কেন? কোন মিছিল নাকি?

আন্না হঠাৎ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলে তুমি হেরচকের কথা আর কাকে বলেছ?

কয়েকজনকে বলেছি।

কারা?

তুমি আর কুলার।

আমার মনে হয়...। চলো ফিরে যাই।

–কেন? একটা জরুরী কাজে এসেছি।

–তুমি যাবে না?

না। তাছাড়া ওর বাড়ির কাছে এত লোক, তুমিই বল ব্যাপারটা না দেখে যাওয়া যায়।

–তাহলে আমি চলে যাচ্ছি?

–তুমি চলে যাবে?

–হ্যাঁ।

কিন্তু একটু আগেই তো আসতে চাইছিলে।

–তা অস্বীকার করছি না।

–তাহলে?

ওখানে লোক জড় হয়েছে কেন?

–সেটাই তো জানতে চাইছি।

ভিড় আমার ভাল লাগে না।

–সে কী। তুমি তো অভিনয় কর।

–সেটা আলাদা ব্যাপার।

মার্টিন এবার একাই এগিয়ে যায়। একজন বলে ওঠে–আপনিও কি পুলিশের লোক?

না।

পুলিশ এখানে কেন?

তারা তো আজ সারাদিন এ বাড়িতে ঢুকছে বের হচ্ছে।

—ও। আপনারা কার অপেক্ষা করছেন?

–লোকটাকে বাইরে আনলে একবার দেখতে পাই।

কাকে?

–হেরচককে।

মার্টিন ভাবে পুলিশ বোধহয় সাক্ষীর জন্য এসেছে। প্রশ্ন করে–হেরচক কি করেছে?

জানি না।

–তাহলে পুলিশ কেন?

–হেরচক খুন হয়েছে না আত্মহত্যা করেছে তা দেখবার জন্য।

–হেরচক নেই!

মার্টিন বিস্মিত ও হতাশা হয়ে পড়ল। তৃতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে নিশ্চয়ই সে কিছু জানত তাই সরিয়ে দিল। তাহলে? হ্যারির মৃত্যু রহস্য আড়ালেই রয়ে যাবে?

ইতিমধ্যে একটা বাচ্চা ছেলে সেই ভদ্রলোকের জামা ধরে টানছে আর বলছে বাবা ফ্রাঙ্কও কত কাঁদছে।

–তুমি শুধু তাই দেখলে।

না বাবা। পুলিশ ওদের জিজ্ঞাসা করছে সেই বিদেশীকে দেখতে কেমন?

ছেলেটির বাবা হেসে ওঠে তারপর বলে–পুলিশ এটাকে খুন বলেই ধরে নেবে, কেননা হেরচক নিশ্চয়ই নিজের গলা ওভাবে কাটবে না।

ছেলেটি এবার মার্টিনকে ভাল করে দেখে বলে বাবা ঐ লোকটাও তো বিদেশী।

–আমার ছেলে বলছে আপনি বিদেশী।

মার্টিন কোন জবাব না দিলেও অস্বস্তি বোধ করে।

লোকটি আবার বলে–পুলিশনাকি আপনাকে খুঁজছে। মার্টিন কোন উত্তর দিলনা। এর মধ্যে পুলিশ হেরচকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। পিছনেফ্রাঙ্ক ও ইলকে। মার্টিন পা বাড়ায় চলে যাবার জন্য। দেখে আন্না দাঁড়িয়ে আছে। গিয়ে বলে–একটা খারাপ খবর আছে।

–কি? খুন হয়েছে?

হা।

চল আমরা চলে যাই। হাওয়া সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

–তাই চল।

তারা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যায়। মার্টিন ভাবতে থাকে হেরচক যাবলেছেসব সত্যিই তাহলে? আমাকে বলে–এবার তুমি বাড়ি যাও।

–তাই যাচ্ছি। এগিয়ে দেবে না?

–না।

জরুরী কাজ আছে?

–আছে ঠিকই, তবে জরুরী নয়।

–তাহলে চলো।

–তোমার ভালোর জন্যই বলছি, এখন থেকে আমায় এড়িয়ে চলা উচিত।

–কেন? তাছাড়া তোমাকে তো কেউ সন্দেহ করছে না।

–কে বলেছে? গতকাল যে হেরচকের বাড়ি গেছিলাম সে সম্বন্ধে পুলিশ খোঁজ নিচ্ছে।

–তাহলে পুলিশের কাছে যাও, তাতে ভালই হবে।

–কি ভাল হবে? ভাল কিছু হবে না। হ্যারি মারা যেতে সব শেষ হয়ে গেছে।

আন্না চুপ হয়ে যায়, হ্যারির নাম শুনে। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হয়ে বলে–তাহলে তুমি। সন্দেহ মুক্ত হতে পারতে।

–আর সন্দেহ মুক্ত। ওদের বিশ্বাস করি না, মাথায় কিছু নেই। নইলে হ্যারির কাঁধে দোষ চাপায়। তাছাড়া ক্যালাওকে মারতে গেছিলাম। সুতরাং ওরা কি আমায় ছেড়ে কথা বলবে?

–তুমি বিদেশী তোমার ওপর আক্রমণ করতে পারে না।

–সে কথা কে বোঝাবে ওদের।

–এটা অন্যায়।

ন্যায় অন্যায় কে বুঝবে বল।

–তাহলে আর পুলিশের কাছে গিয়ে কাজ নেই।

না গেলে হয়ত ভিয়েনায় থাকতে দেবে না।

বললেই হল।

–তুমি বিদেশী আর ওরা পুলিশ। তোমার থেকে ওদের ক্ষমতা বেশী।

–তোমার তো কাগজপত্র ঠিক আছে।

–থাকলেই বা...

–তাহলে তোমার কিছু করতে পারবে না।

–তুমি ওদের চেন না। ওরা আমায় রীতিমত শাসিয়েছে। তবে...

–তবে কি?

–তবে না ঘাটালে কুলার ছাড়া কেউ ধরবে না।

কি ভেবে বলছ?

–মনে হল তাই বললাম।

–ধারণা ভুল হতেও পারে।

–তা পারে। এবার চলি হ্যাঁ।

–আচ্ছা। ও, হ্যাঁ একটা কথা বলার ছিল।

বল।

–হেরচক সামান্য জেনেই খুন হয়েছে।

–তা বলতে পার।

–তুমি সাবধানে থেক।

–ঠিকই বলেছ। আচ্ছা কি করে বলছ হেরচক খুন হয়েছে? আত্মহত্যাও হতে পারে।

না।

–এতটা নিশ্চিত কি করে হলে?

–তা বলতে পারব না, আমার কথাটা মনে রেখ।

–রাখব।

চলি।

মার্টিন হোটেলের দিকে পা বাড়ায় তার কানে যেন আন্নার শেষ কথাগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে। রাস্তা জনহীন, বরফ পড়েই চলেছে। কিছু শব্দ হলেই চমকে উঠছে সে, মনে হচ্ছে কেউ যেন তার পিছু নিয়েছে। ভালয় ভালয় হোটেলে পোঁছে ঘরে যেতে যাবে, কে যেন পিছন থেকে ডাকে। পিছনে তাকাতে দেখে মিঃ স্মিড;বলে কর্নেল আপনাকে ডাকছে। ..

মার্টিন বুঝল সে ঝামেলায় পড়েছে। কিছুক্ষণ পর যাচ্ছি, বলে হোটেল থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করে। বের হতে যাবে একটা লোক পথ আটকে দাঁড়াল। কাছেই একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে, লোকটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে–ঐ গাড়িতে গিয়ে বসুন।মার্টিন নিরুপায়। গাড়িতে বসতেই জোরে চলতে শুরু করে। মার্টিন ভয় পেয়ে চিৎকার করে–এত জোরে চালাচ্ছেন কেন? যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে।

আদেশ আছে–বলে ড্রাইভার যেমন চালাচ্ছিল তেমনি চালাতে থাকে।

আবার চিৎকার করে মার্টিন–এত জোরে চালাবার অর্থ কি? আমাকেও কি হ্যারীর মত খুন করার চেষ্টা চলছে?

কোন উত্তর আসে না।

–আর কতদূর নিয়ে যাবেন।

তাও সব চুপ।

হঠাৎ মার্টিনের মনে হল তাকে বোধহয় গ্রেফতার করা হয়নি, হলে পুলিশ থাকত। মনে হয় বিবৃতি নিয়ে ছেড়ে দেবে।

এক সময় গাড়িটা থামল। ড্রাইভার এসে বলল–ঐ সামনের বাড়িটায় যেতে হবে, আসুন।

বাড়িতে পা দিতে কিছু আওয়াজ কানে আসতে মার্টিন বলে–কোথায় নিয়ে এসেছে আমায় ড্রাইভার জবাব দেবার আগেই দরজা খুলে গেল। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাধিয়ে গেল ওর। জাবিনের গলা শুনতে পেল মার্টিন–আসুন আসুন মিঃ ডেকস্টার। আমরা সবাই চিন্তা করছিলাম একেবারে না আসার থেকে দেরী করে আসা ভাল।

মার্টিন বেয়ারাকে দেখতে গিয়ে এক মহিলাকে দেখতে পেল। তার দুদিকে দুজন বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার যুবক আস্তে কথা বলছে। সামনে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখে একটা বড় পারিবারিক ছবি টাঙান। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখে দরজা বন্ধ। মার্টিনকে কিছু ভাবার অবকাশ না দিয়ে ক্রাবিন বলে কফি খেয়ে সভার কাজ শুরু করা যাক। একজন এসে মার্টিনকে কফি দেয়। এই সময়ে এক যুবক এসে বিনয়ের সঙ্গে বলে–আপনার বইতে যদি একটা সই দেন, ভীষণ খুশী হব।

হঠাৎ কালো সিল্কের শাড়ি পরিহিতা এক মহিলা বলে–মিঃ ডেকস্টার আপনার বই কিন্তু একেবারে ভাল লাগে না আমার। আমার মনে হয় উপন্যাসের গল্পটা সব সময় উচ্চ পর্যায়ের হওয়া উচিত।

–আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু প্রশ্নোত্তরের সময় কথাগুলো বললে জবাব দিতে সুবিধা হবে।

আর একজন মহিলা বললেন–আমি খুব একটা ইংরাজী উপন্যাস পড়িনি। কিন্তু শুনেছি আপনার উপন্যাস।

মহিলাকে থামিয়ে ক্রাবিন মার্টিনকে কিছু গান করতে অনুরোধ জানায়। এরপরে যথারীতি আলোচনা সভা শুরু হল। ক্রাবিন প্রথমে সুন্দর বক্তৃতা দিল। এমনকী মার্টিনকে করা কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তার সম্মান বাঁচায়। মার্টিন প্রথম দিকে ঠিক প্রশ্নগুলো ধরতে পারছিল না।

বাদামী টুপী পরা এক মহিলা প্রশ্ন করল–আপনি কি নতুন কোন উপন্যাস শুরু করেছেন?

–হ্যাঁ।

–কি নাম দিয়েছেন? অবশ্য বলতে যদি আপত্তি না থাকে।

না, না আপত্তির কি আছে।

–তাহলে বলুন।

তৃতীয় পুরুষ।

বাঃ সুন্দর নাম।

ধন্যবাদ।

আর একজন প্রশ্ন করে কার লেখা আপনাকে সবথেকে বেশী প্রভাবিত করেছে?

সহজভাবে উত্তর দেয় মার্টিন–গ্রে।

— নামটা শুনে সবাই যেন বেশ খুশী হল। এক বয়স্ক অস্ট্রিয়ান কিন্তু বলে উঠল–আপনি কোন গ্রের কথা বলছেন? এই নাম তো আদৌ শুনিনি?

মার্টিন হাল্কা সুরে উত্তর দেয়–কেন জন গ্রের নাম শোনেননি।

এই জবাবে ইংরেজ শ্রোতাদের মধ্যে হাসির আলোড়ন তুলে দিল। ক্রাবিন সেই বয়স্ক লোকটিকে বলল–মিঃ ডেকস্টার আপনার সঙ্গে রসিকতা করেছেন।

রসিকতা? আমার সঙ্গে?

–হ্যাঁ। হাসে ক্রাবিন।

–কি ধরনের রসিকতা করলেন?

উনি কবি গ্রের কথা বলেছেন।

অপর একজন এবার প্রশ্ন করে-জেমসজয়েস সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

মার্টিন ভ্রূ কুঁচকে লোকটির দিকে তাকিয়ে বলে–আপনি কি বলতে চাইছেন?

লোকটি ইতস্ততঃ করে, তারপর বলে–মানে আমি বলতে চাইছিলাম আপনি কি তাকে শ্রেষ্ঠ লেখক মনে করেন?

-নামটা কি বললেন, জেমসজয়েস?

–হ্যাঁ।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে মার্টিন-আমি তো নামই শুনিনি। তা উনি কি লেখেন?

মার্টিনের এ হেন উত্তরে শ্রোতারা খুশী না হলেও সাহসিকতার তারিফ করল। ঝড়ের মত বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে আর মার্টিন দায়সারা গোছের জবাব দিতে থাকে, তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে স্ট্রেচার, ফ্রাঙ্ক ও কচের হতাশ মুখ, হেরচকের মৃত্যু। তার মনে হয় যদি তাকে প্রশ্ন না করত ওভাবে তাহলে সে মারা যেত না।

এক সময় সভা শেষ হয় সবাই চলে যেতে শুরু করে হঠাৎ আয়নার দিকে নজর পড়তে দেখে পুলিশ ঢুকছে। কাবিনের এক প্রহরীর সঙ্গে পুলিশ দরজায় দাঁড়িয়ে কথা

বলছে। মার্টিন কি করবে বুঝতে পারে না, সে বোধবুদ্ধি হারিয়ে দরজার দিকেই এগোয়। মিলিটারি পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসা করে আপনি কে? পাশ থেকে এক তরুণ বলে ওঠে উনি বেনজামিন ডেকস্টার।নামকরা লেখক। মার্টিন ঐ তরুণটিকেই জিজ্ঞাসা করল, বাথরুমটা কোনদিকে?

আবার পুলিশটা জিজ্ঞাসা করে আমাদের কাছে খবর আছে বোলো মার্টিন এখানে এসেছে।

তরুণটি উত্তর দেয়–ভুল করছেন। এরপর মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলে দরজার বাইরে দুনম্বর ঘরটা। ধন্যবাদ জানিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবে, দেখে পেইন দাঁড়িয়ে আছে। পেইনকে আমিই পাঠিয়েছিলাম মার্টিনকে চিনিয়ে দেবার জন্য।

মার্টিন পেইনকে দেখেই পাশের একটা দরজা খুলে ঢুকে যায়। ঘরটা অন্ধকার। মার্টিন কাঁপা গলায় বলে–ঘরে কেউ আছেন?

হঠাৎ বাইরে থেকে কে বলে উঠল-মিঃ ডেকস্টার?

আবার সব চুপচাপ। হঠাৎ ঘরের লাইটটা জ্বলে ওঠে। দেখতে পায় পেইন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। বলে–আমরা অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে খুঁজছি। কর্নেল আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

মার্টিন ভাবে এমন এক পরিস্থিতি হয়েছে এখন ক্রাবিনকেও সন্দেহের বাইরে রাখা যাচ্ছে না। ও কি সত্যিই লেখার ভক্ত, এই সভায় ডেকে আনার পিছনে নোংরা উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে নাকি?

.

১০.

মার্টিন দেশে ফিরে যায়নি খবর পেতেই ওর ওপরনজর রাখা শুরু করেছিলাম। পেইন মার্টিনকে নিয়ে আসলে তার কাছ থেকে কার্টস, কুলার ও ক্রাবিন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার পর হ্যারির প্রসঙ্গে আসি। জানতে চাই আর কিছু জানতে পেরেছে কিনা।

মার্টিন মাথা নাড়ে–হ্যাঁ।

আমার কৌতূহল বেড়ে যায় বলি–আর কি?

–একটা অপ্রিয় কথা বলব?

–অপ্রিয় কথা বলুন।

–আমাদের চোখের সামনে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে আপনারা দেখেও দেখছেন না।

আমরা দেখেও দেখছি না?

না, বলতে বাধ্য হলাম।

–কোন ব্যাপারে বলুন তো?

–হ্যারির ব্যাপারে।

–আবার কি ব্যাপার?

–হ্যারি দুর্ঘটনায় মারা যায়নি।

দুর্ঘটনা নয়?

না।

–তবে কি?

হ্যারি খুন হয়েছে।

খুন হয়েছে!

-হ্যাঁ।

আমি রীতিমত অবাক, বললাম–আত্মহত্যা ভেবেছিলাম কিন্তু খুন হয়েছে বলে ধারণা ছিল না।

অনেক কিছু জানানোর পর শেষে মার্টিন বলল–এর একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিল।

–প্রত্যক্ষদর্শী!

–হ্যাঁ।

–সে কে? আর ছিল কেন বলছেন? সে কি বেঁচে নেই?

না বেঁচে নেই।

–বেঁচে নেই?

না। আর তার কাছ থেকে অনেক কিছু জেনেছি।

জেনেছেন?

–হ্যাঁ।

–কি বলেছে।

–তার কাছ থেকে শুনে ব্যাপারটা রীতিমত রহস্যময় মনে হয়েছে।

রহস্যময়।

–হ্যাঁ।

বলুন সে কি বলেছে।

বুঝতে পারছি না সে কেন তৃতীয় ব্যক্তির ওপর এত জোর দিচ্ছিল।

—তৃতীয় ব্যক্তি?

-হ্যাঁ।

নাম বলেছে?

না।

–জানতে পারলেন না?

–পারলে তো সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

–তা অবশ্য ঠিক।

–সেই প্রত্যক্ষদর্শী আমাদের অনুসন্ধানে কোন রকম সাহায্য করতে চায়নি। তাছাড়া...

তাছাড়া কি?

–আপনার লোকও তার কাছে যায়নি।

আমি চুপ করে চিন্তা করতে থাকি।

সবাই মিথ্যে বলেছে।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তার দিকে তাকাই।

বলছি সবাই মিথ্যে কথা বলেছে।

মিথ্যে বলেছে।

–হ্যাঁ।

মার্টিনের কথায় সব গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। এটা যে দুর্ঘটনা তার প্রমান আছে অথচ ও বলছে খুন। হঠাৎ আমার হেরচকের কথা মনে পড়ে যায়। প্রশ্ন করি আপনার সেই প্রত্যক্ষদর্শী কি হেরচক?

-হ্যাঁ।

বিস্মিত হয়ে বলি–আপনি সেই লোক যার সঙ্গে কথা বলার পর হেরচক মারা যায়।

–তা জানি না।

–আপনার সুবিধের জন্যই জানাচ্ছি, অস্ট্রিয়ান পুলিশ আপনাকে সর্বত্র খুঁজছে।

নির্বিকার ভাবে বলল মার্টিন–আমাকে?

-হ্যাঁ। আরও খবর আছে?

–কি?

ফ্রাঙ্ক ও কচ বলেছে আপনি হেরচকের সঙ্গে কথা বলার পর সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

কারণ?

–জানি না।

–তাকে এমন কিছু জিজ্ঞাসা করিনি যাতে ঐ অবস্থা হবে।

–এখন বলুন হেরচকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা আর কে জানত?

–আমি আন্না আর কুলারকে বলেছি।

–শুধু ওদের কে?

হ্যাঁ।

–আর কাউকে না?

না।

–ঠিক মনে করে বলছেন তো?

–হ্যাঁ। তবে একটা কথা মনে হচ্ছে।

কি কথা?

–এমনও হতে পারে কুলারের ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর কুলার হেরচকের মুখ বন্ধ করার জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে খবর দিতে পারে।

–এটা কি শুধু আপনার ধারণা?

–হ্যাঁ।

কুলার কি কিছু আভাস দিয়েছিল?

–ঠিক মনে করার মত কিছু ঘটেনি।

–হয়ত কুলার কিছু করেনি কারণ আপনি যখন কুলারকে হেরচকের কথা বলতে গেছেন তার আগেই সে খুন হয়ে গেছে। এটাও মনে রাখতে হবে।

তার আগেই?

-হ্যাঁ।

–আপনার অনুমান যদি...।

–কিছু খবর অন্ততঃ আমাদের ঠিক থাকে।

মার্টিন ঘাড় নাড়ে।

আর আপনি যে রাতে হেরচকের বাড়ি গেছিলেন সে রাতেই ও খুন হয়েছে। আচ্ছা আপনি তো হোটেলে রাত সাড়ে নটায় ফিরেছিলেন তাই না?

–হ্যাঁ প্রায় ঐ সময়।

–তার আগে কি করছিলেন?

মার্টিন ভাবতে থাকে, তারপর বলে–সারাদিনের ঘটনা নিয়ে চিন্তা করছিলাম রাস্তায় ছিলাম তখন কিছু ঠিক ছিল না।

ঘুরে বেড়াবার কোন প্রমাণ আছে?

–ঘুরে বেড়াবার প্রমাণ?

–হ্যাঁ।

না।

–আপনি ট্যাক্সি চড়েছিলেন?

উহু।

–অর্থাৎ ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকতে চাইছেন।

–তার মানে?

–আপনি হ্যাঁ বললে, ট্যাক্সির নাম্বারটা জিজ্ঞাসা করতাম। এই আর কি।

না চড়লেও বলতে হবে চড়েছি।

আমি মার্টিনকে ভয় পাওয়ার জন্য একথা বললাম। ওর পিছনে সবসময় আমার লোক ছিল, সুতরাং জানি ও নির্দোষ তবে একটু আধটু দোষ তো আছে। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানি একজনের হাতে ছুরি থাকলেও অনেক সময় অন্য একজন খুনটা করে।

হঠাৎ মার্টিন বলে–একটা সিগারেট খেতে পারি?

সম্মতি পেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করে–আপনি কি করে জানলেন আমি কুলারের বাড়ি গেছিলাম।

–জেনেছি, হেসে বলি।

কি ভাবে সেটাই তো জানতে চাই।

অস্ট্রিয়ান পুলিশের কাছ থেকে।

সিগারেটে টান দিতে গিয়ে থেমে যায় মার্টিন। বলে–মিথ্যে কথা। তারা আমায় চেনে না। এবার বলি–আপনি কুলারের বাড়ি থেকে চলে যাবার পর ওই আমায় ফোন করেছিল।

কুলার? আপনাকে?

–হ্যাঁ।

মার্টিন শুনে বিড়বিড় করে তাহলে কুলারকে অপরাধীর পর্যায় ফেলা যাবে না।

একটু চেঁচিয়ে বলে–হ্যারির ব্যাপারে কুলারও মিথ্যে বলেছে।

কুলার নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতেই আমায় ফোন করেছিল।

–আপনি তাহলে কুলারকে সন্দেহ করছেন?

–হ্যাঁ। সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি না। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মার্টিন আমার দিকে তাকিয়ে বলে–আমি বিশ্বাস করি না কুলার এ ব্যাপারে জড়িত। কুলারকে যতটা চিনি, তার সেই সতোর জন্য আমি বাজি ধরতে পারি।

মার্টিনের কথার জোরে আমার সন্দেহ চলে যায় কারণ আমিও তাকে চিনি। সে একজন টায়ার ব্যবসায়ী, ভালই পয়সা।

মার্টিন এবার বলে–আচ্ছা কোন সন্দেহজনক ব্যাপার কিছু ছিল যাতে হ্যারি জড়িত?

না না। ওসবের মধ্যে ও ছিল না। তবে হ্যারির ব্যাপারে কিছু কথা আপনাকে বলতে চাই।

–কি। থেমে গেলেন কেন? বলুন?

না কিছু না।

বলতে আপত্তি নেই, তবে আপনি আঘাত পেতে পারেন।

–তবু বলুন, আমি সব শুনতে চাই, সব কিছুর জন্য আমি প্রস্তুত।

–তাহলে শুনুন।

অস্টিয়ান পেনিসিলিন শুধু মাত্র মিলিটারী হাসপাতালগুলো পেত, কিন্তু বেসরকারীহাসপাতাল গুলোতে দেওয়া হত না। তারা প্রয়োজনে চড়া দামে বাইরে থেকে কিনত।

পেনিসিলিন বন্টন ব্যবস্থায় যারা কাজ করত তারা নিজেদের অপরাধী বলে ভাবত না।

-কেন ভাবত না?

–তারা বলত যারা আমাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে তারাই আসল অপরাধী। অর্থের লোভে বড় সাংঘাতিক, তাই তরল পেনিসিলিনের সঙ্গে রঙীন জল, গুড়ো পেনিসিলিনের সঙ্গে বালি মেশাতে লাগল, তাদের লাভ বেড়ে যেতেলাগলআরযারাব্যবহারকততারাউপকারেরবদলেঅপকার পেত।

-তাইতো স্বাভাবিক।

–যুদ্ধে হাত পা কাটা রোগী বা যৌন ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের বেশী ক্ষতি হতে লাগল।

শিশু হাসপাতালের কথা আর বলবেন না। সে মর্মান্তিক দৃশ্য।

–কেন? কি হয়েছিল?

–শিশুদের ম্যানিনজাইটিসের জন্য কিছু পেনিসিলিনের দরকার পড়ায় চোরাবাজার থেকে নেওয়া হয়েছিল। যার ফলে অনেক শিশুর মৃত্যু, বহু শিশু মানসিক রোগগ্রস্ত। এখনও অনেকে মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মার্টিন অধৈর্য হয়ে বলে-এর সঙ্গে হ্যারির কি যোগ আছে?

–আছে, মিলিটারী ফাইল খুলে তাকে শোনাই। প্রথমদিকে হ্যারিকে বিশেষ বিশেষ জায়গায় দেখা যেতে লাগল, বিশেষ কয়েকজন লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বাড়তে থাকল

সঙ্গে টাকার অঙ্কও। এরপর হ্যারি কিছুটা অসাবধান হয়ে পড়েছিল। আমরা যে তাকে সন্দেহ করছি সে বুঝতে পারেনি।

ওদের এসব কাজকর্ম জানার জন্য আমাদের একজন এজেন্টকে মিলিটারী হাসপাতালে পিয়নের কাজে লাগিয়ে দিলাম। চোরাকারবারে সে যে সব জায়গায় যোগাযোগ রাখত একদিন তার সন্ধান পেলাম, আমাদের হয়ে যে কাজ করত তার নাম হারবিল। তাকে ধমকে জিজ্ঞাসা করলাম কি নাম, কতদিন আছ?

–বেশী দিন নয়।

–তবু কতদিন?

–তিন চার মাস হবে।

–মিথ্যে কথা।

–স্যার ছমাসের বেশী না।

–তোমার কিন্তু বাঁচার আশা নেই।

–হুঁজুর আমায় বাঁচান। এমন কাজ কোনদিন করব না।

জানি তোমার জন্য কত শিশু মারা গেছে, পঙ্গু হয়েছে? আইনের কাছে তুমি রেহাই পাবে না। বড় সাজা তোমার হবে, কেউ তোমায় বাঁচাতে পারবে না। যদি...। ইচ্ছে করে থেমে যাই।

-যদি কি?

যদি তুমি আমাদের হয়ে কাজ কর।

–তা কি করে সম্ভব।

–কেন?

–ওরা আমায় বিশ্বাসঘাতক ভেবে প্রাণে মেরে দেবে।

আমাদের হয়ে কাজ না করলে তোমায় ছেড়ে দেব ভেবেছ?

তারপর অনেক বুঝিয়ে চাপ দিয়ে ওকে রাজী করালাম। ওর সাহায্যে জানতে পারলাম কার্টস এ ব্যাপারে জড়িত এবং এখানে একটা বড় ভূমিকা আছে ওর।

মার্টিন জিজ্ঞাসা করে–তাহলে কার্টসকে ধরলেন না কেন? বিশেষ করে সে যখন অপরাধী।

–ইচ্ছে করে ধরিনি।

–কেন?

ধরলে পুরো দলটা সজাগ হয়ে যাবে। আর আমাদের উদ্দেশ্য দলটাকে ভেঙে দেওয়া।

আমি ফাইল থেকে দুটো ছবি মার্টিনকে দিয়ে বললাম দেখলেই বুঝতে পারবেন এদের নেতা কে? ছবি দেখে মার্টিন স্তম্ভিত, এতদিনের বন্ধুত্ব যেন ভেঙে পড়ল। মনের মধ্যে একটা ব্যথা যেন অনুভব করে সে। দেখেই বোঝা যায় বেশ ভেঙে পড়েছে।

মার্টিনকে চাঙ্গা করার জন্য এক পেগ মদ দিলাম। বাধ্য ছেলের মত পান করে অসহায় ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে যেন সান্ত্বনার ভাষা খোঁজে।

এক সময় স্বাভাবিক হয়ে বলে–আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, আপনারা যেমন হারবিলকে বাধ্য করিয়েছিলেন, তেমনি কোন গোপন চক্র তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হ্যারিকেও কাজে লাগিয়েছিল। নইলে...।

মার্টিন এখনও যেন তার বন্ধুকে দোষী ভাবতে পারছে না।

আমি বললাম–হতেও পারে আবার নাও পারে।

আপনারা হ্যারিকে ধরতে যাবেন বোধহয় ওরা আন্দাজ করেছিল তাই দুনিয়া থেকে ওকে সরিয়ে দিল। আমি আর এখানে থেকে কি করব, ফিরে যাই ইংলন্ডে।

না যাবেন না।

যাব না কেন?

–গেলে অস্ট্রিয়ান পুলিশ আপনাকেই সন্দেহ করবে।

–কেন?

–আমার দৃঢ় বিশ্বাস কুলার তাদের সব জানাবে।

কুলার?

–হ্যাঁ।

–ঠিক বুঝতে পারলাম না।

নিরাপদে কেনা থাকতে চায়। আর আমাদের হাতে কুলারের বিপক্ষে যাবার মত কিছু নেই।

–তাহলে তৃতীয় পুরুষ কে?–

–আমারও একই জিজ্ঞাসা আর তাকে ধরা না পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

৩. মনের জ্বালা

১১.

মার্টিন আমার কাছ থেকে বেরিয়ে গিয়ে মনের জ্বালা জুড়োতে ওরিয়েন্টাল নামে এক নৈশ ক্লাবে ঢোকে। উন্মাদের মত কয়েক পেগ খেয়ে বিল মিটিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। পাশাপাশি আর একটা ক্লাব, ম্যাকসিন। আবার কিছু দুরে চেজ ভিন্টার। একটাতেও আর যায় না মার্টিন। নেশায় সব কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। আমস্টারডম ও ডাবলিনের সেই মেয়ে দুটোর কথা মনে পড়ছে। আবার কিছুক্ষণ পর উদাস হয়ে পড়ে মনটা। হ্যারির কথা মনে আসে। রাস্তা সুনসান শুধু বরফ পড়ে যাচ্ছে। তার ইচ্ছে করছেসব ভেঙে ছারখার করে দিতে। তার মনের আগুন আন্নাকে পুড়িয়ে দেবে। এতদিন সে ভাল ছিল কিন্তু কি পেয়েছে? শুধু বঞ্চনা।

রাত তিনটের সময় মার্টিন আন্নার ফ্ল্যাটে এসে বেল বাজায়। এখানে না এসে সে পারেনি। এক অমোঘ আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে এসেছে। বেল বাজিয়ে এখন যেন অস্বস্তি হচ্ছে তার।

এবার আওয়াজ ভেসে আসে–কে?

–আমি মার্টিন।

–তুমি এত রাতে?

–হঠাৎ-ই চলে এলাম।

আন্না দরজা খুলে বিস্মিত হয়। মার্টিনও নিজেকে সামলে নেয়, ভাবে ওকে সব বলে হাল্কা হবে। কিন্তু উত্তেজিত হয়ে মার্টিন বলে–আন্না আমি সব কিছু জেনেছি।

আন্না বলে–আগে বস। এত রাতদুপুরে চিৎকার করে বাড়ির লোকদের জাগিও না। শান্ত হয়ে বস।

দুজনে মুখোমুখি চেয়ারে বসে। আন্না বলে পুলিশ কি তোমায় ধাওয়া করেছে?

মার্টিন অবাক হয়–পুলিশ!

-হ্যাঁ।

–কই না তো!

–তুমি তো হেচককে গুলি করনি?

হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করছ?

করেছ কিনা আগে তাই বল।

না করিনি।

–তুমি এত মদ খেয়েছ কেন?

মার্টিন চিৎকার করে বলে–বেশ করেছি।

এরপর নিজেকে সংযত করে বলে–ব্রিটিশ পুলিশ বিশ্বাস করেছে যে আমি হেচককে খুন করিনি।

–আশাব্যঞ্জক কথা শোনালে।

তবে হ্যারির ব্যাপারে অনেক কিছু জেনেছি।

তুমি জেনেছ?

–হ্যাঁ।

বল কি জেনেছ?

–ও একটা বিশ্রী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল।

–বিশ্রী ব্যাপার?

–ও আমাদের দুজনকেই ঠকিয়েছে। আমি এটা ওর কাছে আশা করিনি। আমার লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছা করছে।

আন্না উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে–আমায় সব খুলে বল। সব জানতে চাই আমি।

মার্টিনের কাছ থেকে সব শুনে বলে–আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারি? বলে আবার ভাবে মার্টিন মিথ্যা বলছে। হ্যারির কখন এত অধঃপতন হবে? বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকে আন্না। নিজের মনেই বিড়বিড় করতে থাকে। আবার বলে–সত্যি বিশ্বাস করতে পারি?

আমি তোমায় মিথ্যে বলছি এ কথা কি করে ভাবলে?

না না শুধু জিজ্ঞাসা করছি। আসলে মানতে পারছি না।

–আমিও পারছি না। ওর কি এমন দরকার পড়ল এই রাস্তা বেছে নেবার।

–তাই তো ভাবছি, এছাড়া কি অন্য পথ ছিল না?

–তুমিই ভাল বলতে পারবে। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছ।

–আমার সঙ্গে ও বিশ্বাসঘাতকতা করল। ঠগ প্রতারক কোথাকার। ওর কথা শুনতেও ঘৃণা হচ্ছে। রাগে আন্নার চোখ মুখ অন্যরকম হয়ে যায়।

–প্রতারণা শুধু তোমার সঙ্গেই করেনি, আমার সঙ্গেও করেছে। ভাবছি কি করে ও এমন পাল্টে গেল।

–আমি আর ভাবতে পারছি না। ওর কথা আর বল না আমার সামনে, ও মারা গেছে ভালই হয়েছে।

না না, একথা অন্ততঃ তুমি বোল না।

বলতে বাধ্য হচ্ছি।

–তুমি শান্ত হও, বুঝতে পারছি খুব দুঃখ পেয়েছ।

–ও যদি জেলে পচে মরত তাও আমি সহ্য করতাম না।

–জানি এখনও তুমি ওকে ভালবাস।

–আমার একটা কথার জবাব দেবে?

–কি?

–যে হ্যারি টাকার জন্য এ কাজ করল সে বোধহয় আমাদের চেনা ছিল না।

এক এক সময় আমারও তাই মনে হয়।

আমাদের নিয়ে যেন ও ঠাট্টা করে গেছে।

করতেও পারে। সে থাকলে জবাবটা তার কাছ থেকেই চাইতাম। এখন এসব আমাদের মেনে নিতে হবে।

–মেনে নেবে?

তাছাড়া উপায় কি?

–আমি পারব না।

–পারতে যে হবে।

–তুমি ভাবতে পার সেই বাচ্চাগুলোর কথা, যারা মারা গেছে, উন্মাদ হয়েছে।

–মার্টিন, ওসব ভুলে যাও।

–পারছি কোথায়।

–তবু সব কিছু ভোলার চেষ্টা করতে হবে।

–আন্না! মার্টিনের গলা চিড়ে যেন নামটা বেরিয়ে আসে।

–হ্যাঁ, মার্টিন।

–আমি আর ওকে মনে করতে চাই না।

চাও না?

না, আমি...।

–কি? বল? থামলে কেন?

–আমি এখন তোমায় ভালবাসি।

আন্না অবাক হয়ে বলে–আমায়?

–হ্যাঁ আন্না।

–আমিও একটা কথা তোমায় জানাতে চাই।

–কি কথা?

–আমিও তোমাকে ভালবাসি মার্টিন।

–ঠিক বলছ? তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার।

–কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালমত চিনি না।

আন্না ভাবে একবার সে ঠকেছে, দ্বিতীয়বার আর ভুল করতে চায় না। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই মার্টিনকে ভাল লেগেছে। অপরের জন্য ওর মনে দরদ আছে, না হলে মৃত বন্ধুর জন্য এত কে করে!

মার্টিন বলে–তুমি হ্যারিকে মন থেকে মুছে ফেলতে পার না?

–কি করে পারব?

জানি আমি, নইলে ও কথা জিজ্ঞাসা করতে না।

বল, হ্যারিকে কি করে ভুলি?

–মার্টিন অভিমান করে বলে–যা হেরচকের মামলা মিটলে ভিয়েনা ছেড়ে চলে যাব।

চলে যাবে?

–হ্যাঁ।

হতাশ গলায় প্রশ্ন করে আন্না–কেন?

–এখানে থেকে কি করব? তাছাড়া হ্যারিকে কে খুন করল তা জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। যে ওকে খুন করেছে ঠিকই করেছে।নইলে এই পরিস্থিতিতে আমিই হয়ত ওকে খুন করতাম।

–তুমি? আন্না চমকে উঠে বলে।

–হা হা আমি।

কখনোই পারতে না। ..

–ঠিক পারতাম।

তুমি রেগে গিয়ে বলছ। একটু শান্ত হও।

শান্তই আছি, আর আমার অত তাড়াতাড়ি রাগও হয় না। ছিঃ ছিঃ শেষে হ্যারি কি না...। ওর জন্য গর্ব হত আমার, সবাইকে ওর কথা বলতাম।

একটু থেমে আবার বলে–আর তুমি এখনও ঐ জঘন্য লোকটাকে ভালবাস।

হ্যাঁ, ওকে আজও ভালবাসি। ওর ব্যাপারে তুমি এত কিছু জেনেছ বলে আমার ভালবাসায় বিন্দুমাত্র চিড় খাবে না। তবে এটা ঠিক এসব জানার পর আমি স্তম্ভিত।

–তুমি যে ভাবে কথা বলছ তাতে আমার রাগ হচ্ছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে আর তুমি বকে চলেছ।

–আমি তোমাকে এখানে আসতে বলিনি, নিজেই এসেছ।

–তুমি কিন্তু রাগিয়ে দিচ্ছ।

আন্না হেসে বলে একে রাত তিনটের সময় এলে, তারপর রেগে আছ। এখন কি করলে তুমি খুশী হবে।

–আমি এভাবে কখনও তোমায় হাসতে দেখিনি আর একবার হাস।

দুবার হাসার মত কোন ঘটনা ঘটেনি।

–আমি খুব ক্লান্ত, সারাদিন খুব ধকল গেছে।

জানালার কাছ থেকে সরে এস।

–কেন?

–ওখানে পর্দা নেই।

–এত রাতে কেউ দেখবে না।

মার্টিন আস্তে বলে–আন্না এখনও তুমি হ্যারিকে ভালবাস তাই না।

-হ্যাঁ।

সম্ভবত আমিও। কিন্তু কেন জানি না...।

আচ্ছা আজ উঠি।

মার্টিন উত্তরের অপেক্ষা না করে রাস্তায় চলে আসে। হাঁটতে হাঁটতে মনে হয় কেউ তাকে অনুসরণ করছে। পিছন ফিরে তাকাতেই একটা রোগা লোককে দেওয়ালের দিকে চলে যেতে দেখল।মার্টিন চিৎকার করে–কে ওখানে? জবাবদাও? আওয়াজে একটা ঘরের পর্দা উঠে, আলো এসে পড়ল রাস্তায়। কাউকে দেখতে পেল না মার্টিন। অবাক হয় কোথায় গেল? উবে গেল নাকি? স্বচক্ষে দেখেছে তাকে। হতভম্বের মত সামনে এগিয়ে চলে সে।

.

১২.

সকালে মার্টিন আমার অফিসে আসতে অবাক হয়ে যাই, এভাবে আসবে ভাবিনি। সুপ্রভাত জানিয়ে বসতে বলি। জিজ্ঞাসা করি–হঠাৎ কি মনে করে?

–একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই কর্নেল।

–কি? –

-আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?

ভূত?

–হ্যাঁ।

না। আমার মনে হয় মাতালেরা ইঁদুর বা ঐ জাতীয় কিছু দেখলেও ভূতের ভয় পায়। গতকালের আন্না স্মিডের কথা বলার পর বলল একটা লোক তাকে অনুসরণ করছিল, মার্টিন পিছু নিতে কোথায় মিলিয়ে গেল। মনে হয়েছে হ্যারি লাইম যেন এসেছিল।

আমি বললাম–একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

করুন।

–তখন আপনি পান করেছিলেন?

–কেন বলুন তো?

–আগে বলুন, তারপর বলছি।

–হ্যাঁ।

যা ভেবেছি ঠিক তাই।

–কি ভেবেছিলেন?

–ও সব মদের খেয়ালে...

–কিন্তু তখন আমার এমন অবস্থা নয় যে ভুল করব। আর মদ তো নতুন খাচ্ছি না।

যাইহোক তারপর কি করলেন?

–কিছুদূরে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে এক পেগ মদ খেলাম।

–তখনই ভূতটা আবার ফিরে এসেছিল।

–না, আসেনি। ঐ রাতে আবার আন্নার ফ্ল্যাটে চলে গেছিলাম।

মার্টিনের কথা শুনে মনে হল, যে তোক অনুসরণ করছিল সে হ্যারি নয়। মার্টিনকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখে দলের লোককে সাবধান করে দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

মার্টিন আবার যখন আন্নার ফ্ল্যাটে যায় তখন চারটে বাজে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে শোনে নীচে তার নাম ধরে কে ডাকছে। নীচে তাকিয়ে বলে আমায় কিছু বলছেন?

হ্যা।

বলুন।

–আন্তর্জাতিক টহলদারী পুলিশ আন্নাকে তুলে নিয়ে গেছে।

–আমাকে?

–হ্যাঁ।

–কি যা তা বলছেন!

–ঠিকই বলছি উপরে গেলেই দেখতে পাবেন।

আসলে রাশিয়ার ওপর এখন নিরাপত্তার ভার। রাশিয়ার কাছে খবর ছিল আমা তাদেরই নাগরিক।

–আন্না রাশিয়ান নাগরিক?

–হ্যাঁ তাই বলেছে। এখানকার কাগজপত্র জাল।

–জাল?

–হ্যাঁ। নাগরিকত্ব ভাঙিয়ে এখানে বসবাস করছে।

এখানে বলে রাখি ভিয়েনা মিলিটারী পুলিশী ব্যবস্থাগুলো অদ্ভুত ধরণের। এক অঞ্চলের লোকদের পক্ষে অন্য অঞ্চলের লোকদের ধরা মুশকিলের ব্যাপার। প্রত্যেকটা অঞ্চলের খুঁটিনাটি শাসন ব্যবস্থা অন্য অঞ্চলের লোককে মেনে চলতে হয়।

আন্নার ফ্ল্যাটে প্রবেশ করার আগে আমেরিকান পুলিশ জার্মানী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল রাশিয়ানটাকে–কি ব্যাপার। রাশিয়ানটা জার্মান ভাষা বোঝে না, শুধু কতগুলো কাগজ ওর দিকে এগিয়ে দিল। কাগজ দেখে আর কিছু না বলে এগিয়ে যায় তারা। ব্রিটিশ সৈন্যটা ওপরে না উঠে আমায় ফোন করে। কিছুক্ষণ পরই মার্টিন আমায় ফোন করে। তাকে আমি সব জানিয়ে দিই। আমি ফোন পেয়ে আন্নার ফ্ল্যাটের দিকে রওনা হই। রাস্তাতেই

ওদের সঙ্গে দেখা হয় আমার। ব্রিটিশ সৈনন্যর কথায় তারা হেড অফিসে যাচ্ছিল কাগজপত্র পরীক্ষা করতে। ওদের সঙ্গেই রয়েছে আন্না। রাশিয়ানটাকে জিজ্ঞাসা করি, কি হয়েছে তারপর কাগজগুলো দেখে নিয়ে বলি–আন্নার বিরুদ্ধে কোন অপরাধমূলক কাজকর্মের প্রমাণ নেই। ওর বিরুদ্ধে তদন্ত করে তারপর রিপোের্ট পাঠাব। আপাততঃ এখন ওকে ছেড়ে দাও।

.

১৩.

মার্টিন যখন ভূতের গল্প বলছিল আমি বিশ্বাস করিনি। তাছাড়া হ্যারি লাইমের মত লোক মদের ঝোঁকে ভুল দেখেছে তাও মানতে পারছি না। ভিয়েনার ম্যাপটা খুলে বসলাম, ফোন করে জুনিয়ার অফিসারকে হারবিলের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। জানা গেল পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে অন্য অঞ্চলে গেছে। এখন মনে হচ্ছে কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেই ঠিক ছিল। একটু পরে আবার ফোন পেলাম; জানা গেল হারবিল খুন হয়েছে। হারবিলের ব্যাপারে বিস্তারিত খবর জানতে বলে ফোন রেখে মার্টিনকে বললাম–সেই লোকটা যেখানে অদৃশ্য হয়েছে সে জায়গাটা মনে আছে?

-হ্যাঁ।

চলুন যেতে হবে।

–কিন্তু আন্নার কি হবে? ওকে যদি আবার হয়রান করে?

–চিন্তার কিছু নেই। ওর বাড়িতে পুলিশ পাহারা রেখেছি। চলুন যাওয়া যাক।

গাড়ি না নিয়ে সাধারণ পোশাকে ট্রামে করে চলেছি। আজকের আবহাওয়া ভাল। নির্দিষ্ট জায়গায় ট্রাম থেকে নেমে কিছুটা হাঁটার পর মার্টিন বলল কর্নেল এইখানে।

দেখিসামনে একটা পুরনোপাঁচিল,শ্যাওলা পড়া,আগাছায় ভর্তি।এগিয়ে গিয়ে পাঁচিলটা দেখতে চমকে উঠলাম, পাঁচিলের গায়ে একটা দরজা। কি মনেহতে দরজায় টান মারলাম।দরজাটা যে খুলে যাবে ভাবিনি। ভিতরে তাকিয়ে দেখি সিঁড়ি নেমে গেছে। মার্টিন বলে–এসব ঘটবে কে জানত!

-সত্যি কারুর জানার কথা নয়, এখানে দরজার কথা কেউ ভাববেই না।

–আমার মনে হয় নোকটাকে ঠিক দেখেছি।

এখন আমারও তাই মনে হচ্ছে।

কর্নেল, এই সিঁড়িগুলো কোথায় গেছে?

যতদূর মনে হয় যুদ্ধের সময় তৈরী হয়েছিল।

যুদ্ধের সময়?

–হ্যাঁ।

–সে তো অনেক দিনের ব্যাপার। তা কোথায় গিয়ে মিলেছে এগুলো?

-সুড়ঙ্গের সঙ্গে। ভিয়েনার নীচে এই সুড়ঙ্গগুলো একটার সঙ্গে একটা যুক্ত, শহরের প্রধান ড্রেনের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এরকম দরজা সারা ভিয়েনাতেই আছে। আসলে এগুলো তৈরী হয়েছিল বোম্বিং-এর হাত থেকে রেহাই পেতে। এইগুলোকে পাহারা দেবার জন্য অস্ট্রিয়ানদের বিশেষ পুলিশ বাহিনী আছে। এর যে কোন একটা দরজা দিয়ে ঢুকে ভিয়েনার যে কোন অঞ্চলে ওঠা যায়।

মার্টিন অবাক–বলেন কি?

–এই হচ্ছে সেই রাস্তা যেখান দিয়ে আপনাদের বন্ধু হ্যারি হাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

–হ্যারি? মার্টিন চমকে ওঠে।

–হ্যাঁ।

–কি করে হবে! ওকে তো কবর দেওয়া হয়েছে।

–আমি ঠিকই বলছি, সমস্ত প্রমাণ তাই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

–কিন্তু...

কিন্তু কি?

–একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। ওরা কাকে কবর দিল তাহলে?

এখনও জানি না। তবে একটা কাজ করতে বলে এসেছি।

–কোন কাজ? অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে।

–না না আপত্তির কিছু নেই। কবরটা তুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছি।

কবরটা?

হ্যাঁ।

–কিন্তু কবরটা যদি সরিয়ে ফেলে?

এখনও ফেলেনি। সে খবর আমার কাছে আছে। আর এতক্ষণে হয়ত তোলাও হয়ে গেছে। আর একটা কথা শুধু হেরচকই খুন হয়নি আরও একজন খুন হয়েছে।

–আরও একজন?

–হ্যাঁ।

–কে?

–এখন বলতে পারছি না।

বলতে পারছেন না, না বলবেন না?

–জানি না, জানলে বলতাম। আর বাজী ধরে বলতে পারি–হ্যারি এই সুড়ঙ্গের কোথাও লুকিয়ে আছে।

–হ্যারি এর মধ্যে রয়েছে।

–আমার তো তাই মনে হচ্ছে। হ্যারির মৃত্যু, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সব সাজান ছিল।

মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না।

–খুব স্বাভাবিক।

দুর্ঘটনার পর হেরচক তো হ্যারির মুখ দেখেছিল, বলেছিল সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। সত্যি ব্যাপারটার মধ্যে এত রহস্য আছে কে জানত! একবার হ্যারির সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভাল হত।

–তা ঠিক।

তবে ওকে পাচ্ছি কোথায়?

পাওয়া যাবে হয়ত। আপনি একমাত্র লোক যার সঙ্গে হ্যারি কথা বলতে আপত্তি করবেনা, যদিও এটা আপনার পক্ষে বিপজ্জনক।

বিপজ্জনক কেন বলছেন? হ্যারিতো আমার বন্ধু।

–কিন্তু আপনি ওর সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন।

–তা অবশ্য ঠিক। তবু ও আমার ক্ষতি করবে না।

না করলেই ভাল।

করবে না আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

–আপনার বিশ্বাস অটুট থাক।

–আমি এক পলক ওকে দেখেছিলাম, তাই ভাবছি সত্যি ও কিনা। বলুন কি ভাবে এগোব?

আমার মনে হয় ও এ অঞ্চল ছেড়ে কোথাও যাবে না।

–কেন বলুন তো?

–গেলে অসুবিধে হবে।

–কি ধরনের অসুবিধে? নিরাপত্তার অভাব?

–তা হতে পারে; হ্যাঁ যা বলছিলাম। আপনি হ্যারিকে সুড়ঙ্গের বাইরে আনতে পারেন।

–আমি বললে ও কথা রাখবে?

–তা ঠিক। রাখলেও রাখতে পারে। যদি এখনও বন্ধু হিসেবে মনে করে।

করবেনা। সেই ছেটোবেলার বন্ধু আমরা,তবেতার আগেকার্টসের সঙ্গে একবার দেখাকরব।

কার্টসের সঙ্গে?

–হ্যাঁ।

তবে এ ব্যাপারে আপনাকে সাবধান করতে চাই।

–কেন বলুন তো।

–আমার অঞ্চল থেকে গেলে আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি নিতে পারব না, আর হ্যারিও চাইবে না যে আপনি আমার অঞ্চল ছেড়ে রাশিয়ান অঞ্চলে যান।

মার্টিন থমকে গেলেও তারপর দৃঢ় স্বরে বলে–আমি পুরো ব্যাপারটা ভাল ভাবে বুঝে নিতে চাই তাই কার্টসের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

.

১৪.

রবিবারের দুপুরবেলা মেঘলা আকাশ,বরফও পড়ছেনা। রাস্তায় লোক প্রায় নেই বললেই চলে। মার্টিন চলেছে কার্টসের বাড়ির দিকে। রাস্তার একজায়গায় বোর্ডে লেখা রাশিয়ান অঞ্চল।

কার্টসের বাড়ি পৌঁছে বেল বাজায় মার্টিন।ইচ্ছা করেই আগে জানান দিয়ে আসেনি সে।দরজা খুলে মার্টিনকে দেখে অবাক। বলে–আপনি?

মার্টিনের মনে হয় সে হয়ত কারও জন্য অপেক্ষা করছিল। মার্টিন এবার লক্ষ্য করে কার্টসের মাথায় পরচুলা নেই।

কার্টস অসন্তুষ্ট ভাবে বলে ওঠে–এখানে আসার আগে ফোন করে আসা উচিত ছিল।

মার্টিন–তার জন্য ক্ষমা চাইছি।

–আমি তো একটু পরেই বেরিয়ে যেতাম।

একটু পরে বেরতেন এখন তো নয়। আমি কি এবার ভিতরে আসতে পারি?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আহ্বান জানায়-আসুন।

ঘরে ঢুকে দেখে ভোলা আলমারি থেকে কার্টসের ওভারকোট, বর্ষাতি, কয়েকটা টুপী আর পরচুলা উঁকি মারছে।

পরিহাস করে বলে মার্টিন–তাহলে আপনার মাথায় চুল উঠেছে?

কার্টসের মুখের চেহারা সামনের ড্রেসিং টেবিলের আয়না দিয়ে দেখে মার্টিন। এবার মুখোমুখি হতে বলে কার্টস মাঝে মাঝে চুলটা খুলে রাখি, আর ওটা পরলে মাথা বেশ গরম থাকে।

কার মাথা? দুর্ঘটনার সময় পরচুলা পরে থাকলে সহজে অন্যের চোখকে ফাঁকি দেওয়া। সম্ভব না।

কার্টস কোন জবাব দেয় না।

মার্টিন বলে–যা সে কথা, আমি হ্যারির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

–হ্যারি! চমকে ওঠে কার্টস।

–হ্যাঁ। ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলব।

কথা

?–হ্যাঁ।

–ওর সঙ্গে?

হু।

–পাগল হয়ে গেছেন নাকি?

–কে? আমি?

তাই তো মনে হচ্ছে।

–আমার একটু তাড়া আছে, তাই আপনার কথার কোন জবাব দিলাম না।

–শুনে খুশী হলাম।

–এবার আমায় খুশী করুন।

–খুশী করব আপনাকে?

–হ্যাঁ।

–কিভাবে?

দয়া করে এই পাগলের কথা শুনুন তাহলেই হবে।

বলুন কি বলবেন?

যদি হ্যারি বা হ্যারির প্রেতাত্মার সঙ্গে আপনার দেখা হয় তাহলে আমার কথাটা জানিয়ে দেবেন। আমি দুঘন্টা প্রাটারের ভাঙা গীর্জার কাছে যে বটগাছটা আছে ওখানে থাকব।

এখন আসি। ও হ্যাঁ মনে রাখবেন আমি হ্যারির বিশ্বস্ত বন্ধু।

এমন সময় ভেতরের ঘর থেকে কিসের যেন একটা আওয়াজ আসে। মার্টিন শব্দটা অনুসরণ করে দরজার কাছে এসে দরজাটা খুলে ফেলে। দেখে রান্নাঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে ডাঃউইস্কলোর বসে আছে। মার্টিন অবাক, কাছে গিয়ে বলে আপনি এখানে? কি ব্যাপার?

ডাক্তার ইতস্ততঃ করে–মানে...।

মানে কি? মার্টিন কোন কথা না বলে কার্টসের কাছে এসে বলে ডাক্তারকে আমার পাগলামোর কথা বলবেন যদি ওষুধ দিতে পারেন। হ্যাঁ, আবার বলছি ঐটারের গীর্জার কাছে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য থাকব।

প্রাটারের গীর্জার সেই বটগাছটার কাছে মার্টিন ঘণ্টা খানেক হল এসেছে। হ্যারির কোন দেখা নেই। আদৌ সে কি আসবে?

চারদিকে তাকায় মার্টিন। পাহাড়ী এলাকা সামনে ছোটনদী।হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা। হঠাৎ চমকে ওঠে সে। তার নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে শব্দটা তার কানে বিধছে। হ্যারির সেই পরিচিত গানের সুর। চারদিকে দেখে কোথাও কেউ নেই। কিন্তু সে তো ভুল শোনেনি। তাহলে নিশ্চয়ই কাছেই হ্যারি আছে।

সহসা পিছন থেকে কে ডেকে ওঠে-রোলো মার্টিন। চমকে পিছন ফিরে দেখে হ্যারি। হ্যারি হেসে বলে হ্যালো মার্টিন, কেমন আছ?

মার্টিন উত্তেজিত–হ্যারি তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

নিশ্চয়ই তা তো থাকবেই। তোমাকে যখন আসতে লিখেছি, সত্যি মার্টিন এতদিন পর তোমায় দেখে কি যে ভাল লাগছে।

-কেন? আমি তো তোমার অন্ত্যেষ্টির সময় উপস্থিত ছিলাম।

হ্যারি হেসে বলে-লোককে কেমন ফাঁকি দিয়েছি বল!

–তোমার প্রেমিকাকে ফাঁকি দিয়ে কিন্তু মোটেই ভাল করনি।

তুমি আন্নার কথা বলছ?

–হ্যাঁ। ও ভীষণ কাঁদছিল।

–সত্যি মেয়েটা ভাল। আমি ভালবাসি ওকে।

–তোমার সম্বন্ধে পুলিশ যা বলছে আমি বিশ্বাস করিনি। আচ্ছা কি ব্যাপার বলতো?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে হ্যারি–তোমাকে কোনদিন কিছু লুকোইনি, আজও সব খুলেই বলব।

– হ্যারির মনে তোলপাড় চলছে। চুপ করে থাকে। মার্টিন নীরবতা ভঙ্গ করে বলে–শিশু হাসপাতালটাকে দেখেছ? দেখলেই বুঝবে কি অবস্থা হয়েছে?

–জানি। একবার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখ।

–কেন? কি আছে?

–দেখই না।

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে লোক যাতায়াত করছে, ওপর থেকে বিন্দুর মত দেখাচ্ছে।

হ্যারিলে নিচের ঐবিন্দুগুলো যদিদুচারটে থেমে যায় তাহলে সমাজের কি খুবক্ষতি হবে?

-তুমি কি বলছ? তোমার কি মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

না বন্ধু। একটা বিন্দু থেমে গেলে তোমার পকেটে যদি কুড়ি হাজার পাউন্ড আসে তাহলে কেমন হয়?

–তুমি টায়ারের ব্যবসায় থাকলে না কেন?

–ওতে লাভ কম হয়।

–তাতে তো মনে শান্তি পেতে।

–শান্তি।

–হ্যাঁ।

কুলারের মতন। না না এত ছোট কাজে আমি নেই। তুমি দেখ পুলিশ আমায় ধরতে পারবে না। আমি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াব।

–কিন্তু সেটা কি বাঁচা?

মার্টিন দুঃখ পায় ভাবে হ্যারি আজ কোথায় নেমে গেছে। তার মনে হয় তাকে যদি এখান থেকে ধাক্কা দেয় তাহলেই সব শেষ। হ্যারির বাঁচার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

আবার বলে মার্টিন–তুমি জান পুলিশ তোমার কবর খুঁড়েছে?

–শুনেছি।

–তবু তুমি নির্বিকার। একটা কথার জবাব দেবে?

–কি?

বল দেবে কি না?

–দেবার হলে নিশ্চয়ই দেব।

–ঐ কবরে কার মৃতদেহ?

হারবিল।

–হারবিল?

হ্যাঁ।

মার্টিন স্তব্ধ। তার মাথায় যেন কিছুই আসছেনা। মানুষ কত কি করতে পারে। দুনিয়ায় টাকাই সব, আর বিবেক?

মার্টিন রেগে গিয়ে বলে-তোমায় কি করতে ইচ্ছা করছে জান?

-কি?

–বলব? এই পাহাড়ের ওপর থেকে ঠেলে নিচে ফেলে দিতে।

না তুমি পারবে না। কারণ এর আগে আমার বহু অপরাধ ক্ষমা করেছ। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি তাই তোমার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারিনি। (একটু থেমে) এখানে আসতে কার্টিস মানা করেছিল। আসলে তোমায় যে ভালবাসি।–

-ভালবাস?

–হ্যাঁ।

কার্টস কি বলেছে জান? তোমায় মেরে ফেলতে।

–মেরে ফেলতে?

--হ্যাঁ।

–কিন্তু হ্যারি গায়ের জোরে তুমি তো আমার সঙ্গে পারবে না।

সব সময় কি গায়ের জোর দরকার হয়?

–তা অবশ্য ঠিক।

তাছাড়া আমার রিভলবার আছে।

–তা তো থাকবেই।

–থাকবেই কেন বলছ?

নইলে তোমায় মানাবে কি করে?

বুঝলাম না কথাটা।

খুব সোজা।

–সোজাটাই শুনি।

–একদিন যে হাতে ছুরি কাঁচি ধরতে শিখেছিলে আজ সে হাতে পিস্তল, সত্যি ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস।

–ও সব তত্ত্ব কথা ছাড়।

–তা নয়ত কি?

–চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

রাখ তোমার ধর্মের কাহিনী।

–তা তো বলবেই।

–জান তুমি নিচে পড়ে গেলে তোমার চিহ্ন কেউ খুঁজে পাবে না। ও সব ডাক্তারী কথা তুমি জানবেই বা কি করে।

এবার হ্যারি নিজেকে স্বাভাবিক করে বলে কি বোকার মত আমরা করছি। বাদ দাও। চলো মার্টিন ফেরা যাক।

–ফিরবে?

হ্যাঁ।

–কোথায়?

আগে তুমি বল কার্টস আর ডাক্তারের পিছনে পুলিশ লাগিয়ে দেবে না।

–সেটা পরের কথা।

–জান কার্টস তোমায় মেরে ফেলতে বলেনি। আমি একটু ঠাট্টা করছিলাম।

ঠাট্টা।

–হ্যাঁ, বিশ্বাস কর। বানিয়ে বলছিনা। বলেই হ্যারি যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। মার্টিন চিৎকার করে হ্যারি!

পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডাক ফিরে আসে; হ্যারি! হ্যারি! হ্যারি!

.

১৫.

রবিবার সন্ধ্যায় যোশেফস্টড থিয়েটারে আন্নার অভিনয় ছিল। মার্টিন তার সঙ্গে দেখা করবে বলে থিয়েটার শেষ হতে তার ঘরে গেল।

আন্না প্রশ্ন করে কি খবর?

শুনলে তুমি চমকে উঠবে।

–তাই বুঝি?

–হ্যাঁ।

–তা খবরটা কি?

–আগে বল কথাটা বিশ্বাস করবে?

বিশ্বাস না করার কি আছে?

–হ্যারি...।

–কি, বল, থামলে কেন?

–হ্যারি বেঁচে আছে।

–হ্যারি বেঁচে আছে?

–হ্যাঁ।

না না, মিথ্যে কথা।

মিথ্যে?

–হ্যাঁ।

–আন্না বিশ্বাস কর। মিথ্যে বলে আমার লাভ!

–তুমিই জান।

–আর কিছু বলার নেই তাহলে।

আন্নাচুপ, মার্টিন ভেবেছিল আন্না কথাটা শুনলে খুশী হবে।তবেসত্মিকথা হ্যারির কোন ব্যাপারে আর আন্না খুশী হোক সে চায় না। আন্নার দিকে তাকিয়ে দেখে তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। আস্তে আস্তে সমস্ত কথা সে আন্নাকে বলে। মার্টিনের মনে হয় সে যেন মন দিয়ে শুনছে না।

মার্টিনের কথা শেষ হলে, চোখ মুছে আন্না বলে–এর চেয়ে হ্যারি মারা গেলেই ভাল ছিল।

ঠিকই বলেছ। ও আমাদের ভালবাসার কোন দামই দিল না। সত্যি লজ্জার কথা।

–ও মারা গেলে অনেক বিপদের হাত থেকে বাঁচত।

সেই হতভাগ্য বাচ্চাগুলোর ছবি আন্নার টেবিলে রাখল। আন্না সেগুলো দেখার পর। বলল–হ্যারিকে এ অঞ্চলে আনতে না পারলে পুলিশ ওকে ধরতে পারবে না।

হু।

–তোমার সাহায্য দরকার।

–আমার সাহায্য।

–হ্যাঁ।

–আমার ধারণা ছিল তুমি তার প্রকৃত বন্ধু।

বন্ধু ছিলাম।

–ছিলে?

হ্যাঁ। এখন নেই।

—তাহলে তো ধরিয়ে দিতে চাইবেই।

–হ্যাঁ চাইছি। সে তোমার ভালবাসার কোন মূল্য দিয়েছে? তোমায় ঠকিয়েছে, তোমায় নিঃস্ব করেছে।

–তবু হ্যারিকে ধরতে তোমায় সাহায্য করব না।

করবেনা?

না, তবে...।

–তবে কি?

–আমি আর ওকে দেখতেও চাই না। গলার স্বরও শুনতে চাইনা।

–সত্যি তুমি একজন অভিনেত্রী।

হঠাৎ এ কথা? বলতে বাধ্য হচ্ছি।

–কিসের জন্য?

সার্থক তোমার অভিনয়। এখনো হ্যারির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ।

–আমি অভিনয় করছি?

–তা নাতো কি?

কথাটা বুঝিয়ে বলবে?

জলের মত পরিষ্কার।

–তবু শুনতে চাই।

–হ্যারির সঙ্গে দেখা করবেনা, গলার আওয়াজও শুনবেনা তবুও তাকে ধরিয়ে দিতে তোমার বাঁধছে। সত্যি তোমাদের নমস্কার। সার্থক সৃষ্টি ভগবানের। তোমাদের কোনটা হা, কোনটা না, আজও বোঝা গেল না। হাসতেও যেমন সময় লাগে না, কাঁদতেও তাই।

তুমি আমাকে যতই আঘাত দিয়ে কথা বল আমি ও কাজ করব না।

বাঃ চমৎকার।

–এটাও জেনে রাখ এমন কোন কাজ করব না যাতে হ্যারির কোন ক্ষতি হয়।

–সুন্দর! সুন্দর! হাততালি পাবার মত সংলাপ। তুমি কি এখনও হ্যারিকে চাও।

–তাকে চাই না ঠিকই কিন্তু…।

–কিন্তু কি?

–আমার রক্তের সঙ্গে ও মিশে একাকার হয়ে গেছে, আমার কাছে হারিই এখনও স্বপ্নের পুরুষ, অন্য কেউ নয়।

মার্টিন আর অপমানিত হতে চায় না, তাই কোন কথা না বলে বেরিয়ে আসে।

কর্নেলের কাছে এসে বলে–আমায় কি করতে হবে বলুন?

এবার শেষ দৃশ্যের অভিনয় হবে।

এত তাড়াতাড়ি সম্ভব?

–চেষ্টার তো ত্রুটি করিনি।

–ও হ্যাঁ। কফিন থেকে মৃতদেহ তোলা হয়েছে?

–হ্যাঁ।

কার?

হারবিলের।

—তাহলে হ্যারি ঠিকই বলেছে।

–আমরা এবার কুলার ও ডাক্তারকে গ্রেফতার করতে পারি।

–তাহলে ভাল হয়।

–তবে কার্টস ও ড্রাইভার হাতের বাইরে।

–কেন?

রাশিয়ানদের অনুমতি লাগবে।

–একটা কাজ করতে পারবেন?

—কি?

–আপনি কুলারকে সাবধান করে আসুন।

–আমি?

–হ্যাঁ।

–তাতে কি ভাল হবে?

হবে।

–যদি বিপরীত ফল হয়?

–মানে? কুলারের সন্দেহ হবে? পালিয়ে যাবে তাই?

–হ্যাঁ।

–আমি চাই কুলার পালিয়ে যাক। তাতে বড় শিকারটা জালে পড়বে।

–কেন?

–আপনার উপর হ্যারির বিশ্বাস জন্মাবে ঘণ্টা তিনেক পর হ্যারিকে খবর পাঠাবেন। পুলিশ আপনাকে খুঁজছে এ সময় লুকিয়ে থাকাই ভাল নইলে বিপদ ঘটবে। কি? এ প্রস্তাবে রাজী?

সেই অসুস্থ বিকৃত বাচ্চাগুলোর ছবির দিকে তাকিয়ে বলিরাজী।

ধন্যবাদ।

–আমি খুনীর সঙ্গে কখনও আঁতাত করব না।

–এই তো চাই, সাবাস!

.

১৬.

পরিকল্পনা মত সবই ঠিকঠাক চলছে। কুলারকে সাবধান করার জন্য ডাক্তারের গ্রেফতারী পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে মার্টিন আবার কুলারের সঙ্গে দেখা করে। কুলার মার্টিনকে খুশী হয়েই স্বাগত জানায়। বলে কর্নেলের সঙ্গে নিশ্চয়ই ঝামেলা চুকে গেছে। মার্টিন জানায় একটু তো গণ্ডগোল হয়েছে। এ কথায় কুলার চমকে ওঠে। দমে না গিয়ে বলে–হেরচকের ব্যাপারে কর্নেলকে জানিয়েছি বলে কিছু মনে করেননি তো?

–এতে মনে করার কি আছে?

শুনে খুশী হলাম, আর আপনি তো নির্দোষ।

–কি করে জানলেন?

-জানি।

–জেনে থাকলে ভাল।

–সুতরাং ভয়ের কারণ নেই আপনার, আর একজন নাগরিক হিসেবে কর্নেলকে সব জানান কর্তব্য।

–আপনি যেমন হ্যারির সময় পুলিশের কাছেমিথ্যে বলে ভদ্রনাগরিকের পরিচয় দিয়েছিলেন!

–সত্যি। কর্নেলের ব্যাপারে আপনি খুব রেগে আছেন।

-পুলিশ সেই কবরটা খুঁড়ে ফেলেছে জানেন তো। আর ডাক্তার ও আপনাকে তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করবে।

–গ্রেফতার? ঠিক বুঝলাম না।

–ঠিকই বুঝেছেন। মার্টিন আর কথা না বাড়িয়ে চলে যায়।

আমাদের প্রাথমিক কাজ শেষ এবার শুধু জাল পাতা বাকি। ভিয়েনার ম্যাপ দেখে মনে হল হ্যারির বের হবার এটাই ভাল রাস্তা। এই দরজার পঞ্চাশ গজ দূরে একটা রেস্তোরাঁ। আর কোন দরজার কাছে এসব নেই। সুতরাং হ্যারি বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে পঞ্চাশ গজ রাস্তা পার হয়ে ক্লাব থেকে বন্ধুকে নিয়ে আবার ঐ পথেই চলে যাবে।হ্যারিরকাছে এই কায়দাটা নতুন কিন্তু আমাদের নয়। সুড়ঙ্গ পাহারা দেবার জন্য একটা দল রাত বারটায় যায় আর রাত দুটোয়– আর এক দল আসে, হ্যারি এই সময়টাকেই বাছবে বন্ধুকে নিয়ে যাবার জন্য।

সেই অনুযায়ী মার্টিন ঐ রেস্তোরাঁয় অপেক্ষা করছে। মার্টিনকে একটা রিভলবার দিয়েছি আত্মরক্ষার জন্য। সেই নির্দিষ্ট দরজার অদূরে সাদা পোষাকে পুলিশ লুকিয়ে আছে। সুড়ঙ্গ পাহারা দেবার একটা বিরাট দল আমার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। আমি সংকেত দিলেই সব ম্যানহোল বন্ধ করে দেবে। আর শহরের প্রান্ত ভাগ থেকে টহল দিতে দিতে এদিকে আসবে। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল হ্যারি সুড়ঙ্গে ঢোকার আগে ধরা পড়ুক। এতে মার্টিনেরও বিপদ কম হবে, ঝামেলাও কম হবে।

রেস্তোরাঁতে এখন অনেক নোক। বাইরে ভালই ঠাণ্ডা চলছে। মার্টিন যেখানটা বসে আছে সেখানটাও খোলা মেলা। তাই কফি খেয়ে শরীর গরম করছে।

মার্টিনের কিছু দূরে আমার একটা লোক বসিয়ে রেখেছি আর পাছে কারুর সন্দেহ হয় তাই এক লোককে বেশীক্ষণ রাখছি না। আমি কিছুটা দূরে ফোন নিয়ে বসে আছি। একঘন্টার ওপর হয়ে গেল হ্যারির দেখা নেই। হঠাৎ ফোন বেজে উঠতে ব্যস্তভাবে রিসিভার তুললাম, মার্টিন এর ফোন–আমি ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি কর্নেল।

–হ্যাঁ, খুব ঠাণ্ডা।

–প্রায় শোওয়া একটা বাজে।

–সত্যি অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে।

–আর কি অপেক্ষা করব?

–হ্যাঁ অবশ্যই।

–হু।

–আপনাকে আমার টেলিফোন করা উচিত হয়নি। যেমন চুপচাপ বসে আছেন বসে থাকুন।

অনেক কাপ কফি খেয়ে ফেলেছি।

আরও খান।

শরীর খারাপ করছে।

–দেখুন মিঃ মার্টিন হ্যারি যদি আসে তবে আর বোধহয় দেরী করবে না।

–আর এসেছে!

–অন্ততঃ আর মিনিট পনের কুড়ি অপেক্ষা করুন।

–ঠিক আছে।

—-আর ভুলেও আমায় ফোন করবেন না।

–হায় ভগবান! ঐ তো হ্যারি, সঙ্গে সঙ্গে মার্টিনের ফোন বন্ধ। আমি ফোন নামিয়ে রেখে নির্দেশ দিই ম্যানহোলগুলো বন্ধ করতে। টহলদারী পুলিশকে বলি এবার আমরা নীচে নামব।

এদিকে হ্যারি মার্টিনকে ফোনে কথা বলতে দেখে সাবধান হয়ে পড়েছিল। তাই মার্টিন রিসিভার নামিয়ে রাখার আগেই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময় আমারও কোন লোক সেখানে ছিল না। আসলে একজন উঠে গিয়ে আর একজন যে যাচ্ছিল তার পাশ দিয়েই হ্যারি বেরিয়ে গেল। মার্টিন বাইরে বেরিয়ে আমার লোককে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু যখন চিৎকার করে বলল ঐ তো হ্যারি, ততক্ষণে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে গেছে সে।

আমরাও সুড়ঙ্গে নেমে এসেছি হাতে টর্চ। চারদিক দিয়ে জল পড়ার আওয়াজ আসছে। সব সুড়ঙ্গগুলো কোমর পর্যন্ত জলে ভর্তি। ভেতরটা বেশ অন্ধকার। সুড়ঙ্গের আসল রাস্তাটা টেমসের প্রায় অর্ধেক। জলে স্রোত রয়েছে বলে পা ফেলতে অসুবিধে হচ্ছে। বাঁকের মুখে কাদা জমে আছে। পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে হ্যারি কোন দিকে গেছে।

আমার প্রহরীর এক হাতে টর্চ এক হাতে রিভলবার। মার্টিনকে চাপা গলায় সে বলল–আপনি আমার পিছনে আসুন।

-পিছনে গেলে অসুবিধে হবে না?

না।

–ওকে আপনি চিনতে পারবেন?

–হ্যাঁ। পিছনে যেতে বলছি কেন না ও আপনাকে গুলি করতে পারে।

–তাহলে আপনিই বা সামনে থাকবেন কেন?

–এটা আমার চাকরীর অঙ্গ।

প্রত্যেকটা ম্যানহোলে পাহারা রয়েছে, সমস্ত সুড়ঙ্গটা আমরা ঘিরে ফেলেছি। ছোট ছোট গলি পথ ধরে আসল পথটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

প্রহরীটা বাঁশী বাজালে পাশ থেকে অনেকগুলো বাঁশীর আওয়াজ ভেসে আসল। প্রহরী বলল–আমার টহলদারী বন্ধুরা সবাই এখানে এসে গেছে, এই জায়গাটা সবার নখদর্পণে। সামনের। দিকে কি আছে দেখার জন্য টর্চ তুলতেই গুলি ছুটে এল। প্রহরীটা যন্ত্রণায় কাতরে উঠল, হাত থেকে টর্চ পড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললাম–কোথায় লেগেছে?

– তেমন কিছু না। হাতটা বোধহয় ছড়ে গেছে। আমার সঙ্গে আর একটা টর্চ আছে, এটা ধরুন। ততক্ষণে ক্ষতস্থানটা বেঁধেনি। কিন্তু স্যার টর্চটা জ্বালাবেন না। ও বোধহয় কাছের কোন গলিতে লুকিয়ে আছে। গুলির প্রতিশব্দ মিলিয়ে যেতে বাঁশীর আওয়াজ শোনা গেল। প্রহরীটিও বাঁশী বাজিয়ে উত্তর দিল। মার্টিন এবার প্রহরীটিকে জিজ্ঞাসা করে– আপনার নামটা এখনও জানা হয়নি।

-বেটস্। আজ এখানে আমার আসার কথা নয়। শুধু স্পেশাল ডিউটি বলেই এসেছি।

আমি এবার সামনে থাকব। হ্যারি আমায় গুলি করবে বলে মনে হয় না। আর হ্যারির সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

–কিন্তু স্যার, আমি দুঃখিত।

–কেন?

আপনার যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেই নির্দেশই আছে।

–ঠিক আছে, ঠিক আছে। মার্টিন বেটসকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যায়। চিৎকার করে ডাকে–হ্যারি। হ্যারি।

কথাটা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আবার বলে–হ্যারি লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। তুমি বেরিয়ে এস। হঠাৎ কাছ থেকে হ্যারির গলার আওয়াজে সবাই চমকে যায়। হ্যারি বলেবন্ধু, তুমি আমায় ক করতে বলছ?

মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এস হ্যারি।

আমার সাথে টর্চ নেই। কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

পিছন থেকে বেটস বলল-স্যার সাবধান।

মার্টিন বলে–আপনারা দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ান। ও আমায় কখনও গুলি করবে না।

আবার হ্যারিকে বলে–হ্যারি টর্চ জ্বালছি, বেরিয়ে এস। আর কোন উপায় নেই, ধরা তোমায় দিতেই হবে।

টর্চ জ্বললে কুড়ি গজ দূর থেকে হ্যারি বেরিয়ে এল। মার্টিন বলল–মাথার ওপর হাত রাখ। হ্যারি হাত তোলার ভান করে গুলি চালায়। গুলি মার্টিনের গায়ে না লেগে সুড়ঙ্গের দেওয়ালে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে বেটস চিৎকার করে সার্চ লাইট জ্বালতে বলে। আলো জ্বললে দেখা যায় সবাইকে। বেটস জলে উপুড় হয়ে আছে যন্ত্রণায় কাতর। মার্টিন থর থর করে কাঁপছে। হ্যারি কিছুটা দূরে। মার্টিনের গুলি লাগার ভয়ে আমরা হ্যারিকেও গুলি করতে পারছি না। আমরা আস্তে আস্তে এগোতে থাকি। চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় হ্যারি কোন উপায় না দেখে বড় সুড়ঙ্গের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সার্চ লাইট ঘোরাবার আগেই ডুব দিয়েছিল তার ওপর স্রোত থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল। মার্টিন সার্চ লাইটের আলো যতদূর যায় তার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে হাতে রিভলবার। হঠাৎ আমার মনে হল সামনে কি যেন নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললাম-মিঃ মার্টিন আপনার বাঁ দিকে গুলি করুন। মার্টিন তৎক্ষণাৎ গুলি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রনার শব্দ ভেসে উঠল। সামনে এগোতে গিয়ে দেখি রেটসের প্রাণহীন দেহ। মার্টিনের ছোঁড়া গুলি

তার গায়ে লেগেছে। সামনে তাকিয়ে দেখি মার্টিন নেই।নাম ধরে ডাকতে থাকি কিন্তু জলের শব্দে কিছুই যেন শোনা যায় না। পরক্ষণেই একটা গুলির আওয়াজ পেলাম। মার্টিন অন্ধকারে খানিকটা এগিয়ে গেছিল, টর্চ ইচ্ছা করে জ্বালেনি। হ্যারি মার্টিনের গুলিতে আহত হয়ে সিঁড়ির দিকে এগোতে থাকে। ত্রিশ ফুট উঁচু ম্যানহোল-এর মুখ থেকে সিঁড়িটা নেমে এসেছে। হ্যারি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করলেও ওপরে উঠতে পারল না। আর তখনই যেন সেই পরিচিত সুরটা শিস দিয়ে ডাকছিল। শিসের শব্দে এগিয়ে গিয়ে ডাকল মার্টিন হ্যারিকে। ঠিক তখনই আবার শিস থেমে গেল। আর কিছুদূর এগিয়ে যেতে মার্টিনের পায়ে কিছু ঠেকল। আলো জ্বললে দেখি হ্যারি পড়ে আছে হাতে বন্দুক নেই। মনে হল মারা গেছে কিন্তু যন্ত্রণায় কাতরানোর আওয়াজ পাওয়া গেল। মার্টিন কানের কাছে মুখ এনে ডাকে–হ্যারি! হ্যারি!

হ্যারি চোখ তুলে কিছু বলার চেষ্টা করল। আমি মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে স্পষ্ট শুনি বলছে–বোকা কোথাকার! মার্টিন বলে–আমি আজও বুঝতে পারিনি হ্যারি কেন ওকথা বলেছিল। আজ আমার মনে পড়ছে, যে আমি জীবনে একটা খরগোস মারিনি সেই আমি প্রাণের বন্ধুকে মেরে ফেললাম, সত্যি ভগবানের কী খেলা! আমি মার্টিনকে সান্ত্বনা দিই–মিঃ মার্টিন এখন আমাদের এসব ভুলতে হবে। মার্টিন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়-না কর্নেল আমি অন্তত পারব না।

.

১৭.

মেঘলাভাব কেটে গেছে। ইলেকট্রিক ড্রিল দিয়ে কবর খোঁড়ার দরকার আজ আর নেই, চারিদিকের আবহাওয়া জানিয়ে দিচ্ছে এখন বসন্তকাল প্রকৃতিও যেন হ্যারীর উপর প্রসন্ন।

হ্যারীর প্রিয়জনের প্রায় কেউ নেই ডাক্তার ও কার্টস প্রায় অনুপস্থিত। কেবল সেই মেয়েটি দ্রুত রাস্তায় দিকে এগিয়ে গেল। তখন একটা ট্রাম খুঁড়ো বরফ ঠেলে এগিয়ে চলেছে। আমি মার্টিনকে প্রশ্ন করি–আপনার সঙ্গে গাড়ী আছে? নাকি আমি পৌঁছে দেব?

না, ধন্যবাদ, আমি ট্রামে যাব?

আমি বলি–শেষ পর্যন্ত আপনিই জিতলেন, আর আমি হেরে গেলাম।

মার্টিন ব্যথিত কণ্ঠে বলে-না, না, কর্ণেল, আপনি একথা বলবেন না। আমি সব হারিয়ে ফেলেছি।...সব হারিয়ে ফেলেছি।

তারপর মার্টিন একটাও কথা না বলে বড়-বড় পা ফেলে মেয়েটির দিকে এগিয়ে যায়। আমি কিছু দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, ওরা পাশাপাশি হাঁটছে। মনে হয় ওরা নীরবে হেঁটে চলেছে। একটা বোবা দুঃখ তাদেরকে ঘিরে রয়েছে।

সত্যি, বলা যায় না বিপদ কখন আসবে, কার দ্বারা সে শত্রুই হোক আর কোনও প্রিয়জনই হোক।

99